একক ৩ ❑ মুঘল শাসন নীতির প্রকৃতি

গঠন

৩.০ আকবর
৩.১ রাজ্যজয় এবং আকবরের উত্তর ভারতের অভিজাতদের সঙ্গে আপোষ
৩.২ আকবরের ধর্মীয় নীতি
৩.৩ জাহাঙ্গীর
৩.৪ শা-জাহান

৩.০ আকবর

১৫৫৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী কাহানারে আকবরের রাজ্যভিষেক ঘটে। বৈরাম খাঁ আকবরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। বৈরাম খাঁ ছাড়াও তাঁকে অন্যান্য কয়েকজন পরিচালনা করেন। আকবরের রাজত্বের প্রথমদিকে রাজ্যভার পরিচালনা করছিলেন মূলত তাঁর মাতা হামিদা বানু, এবং মাহাম আনাগা। আকবর ধীরে ধীরে নিজেকে এই নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে মুক্ত(করেন। ১৫৬২ সালে তিনি একজন যথার্থ শাসক হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকে রাজ্যজয়ের নীতি অনুসরণ করেন। অপরদিকে তিনি ছিলেন উদার, সুফিবাদে বি(াসী এবং তিনি জিজিয়া (Ziziah) নির্মূল করেন। রাজ্যজয়ের শেষে তিনি নীতি পরিবর্ত্তন করেন। আকবরের যথার্থ পরিচয় আমরা পেতে পারি তাঁর ত্র(মবিকাশের মধ্যে দিয়ে। তিনি মূলত সম্রাট এবং পরে দার্শনিক।

আকবরের শৈশব কাটে বেশ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। তিনি বড় হয়েছেন তাঁর কাকাদের অধীনে, যারা তাঁর পিতার প্রতি সদয় ছিলেন না। ফলে অবহেলার সাথেই তিনি তাঁর শৈশব কাটিয়েছেন। তিনি শি(াগ্রহণের সামান্য সুযোগই পেয়েছিলেন, তবুও তিনি ছিলেন এক অত্যন্ত বিচ(ণ রাজা। বহুবিধ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁকে খুব সাহায্য করেছিল। তিনি নিজে কখনও লেখেননি কারণ তিনি কোনো প্রচলিত নীতির অবলম্বনকারী হিসেবে চিহ্নি(ত হতে চাননি। তিনি একদিকে গোঁড়া সুন্নিদের সাথে পরিচিত ছিলেন, আবার অপরদিকে মধ্য এশিয়ার উদার সুফিবাদে বি(াসী ছিলেন। সুফিবাদের সাথে তাঁর যোগাযোগ তাঁর মাতার কারণে। তিনি সুফিবাদের শি(া পেয়েছিলেন তাঁর শি(ক ফৈজল (Faizl) এবং আবুল ফজল (Abul Fazal)-এর কাছ থেকে।

আবুল ফজল এবং বাদৌনীর পরস্পরবিরোধী মূল্যায়নের জন্য আকবরের যথার্থ পরিচয় পেতে আমরা সমস্যায় পড়ি। আবুল ফজল-এর মতে আকবর এবং আল্লাহ সমতুল্য, এবং আকবর গভীর ধ্যানে আল্লাহ-র সাথে কথাও বলেছিলেন। অপরদিকে সুন্নিদের গোঁড়া নেতা, বাদৌনী-এর মতে আকবর ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করেন এবং এক নতুন ধর্ম দীন-ই-ইলাহী (Din-i-Ilahi)-র প্রবর্তন করেন।

৩.১ রাজ্যজয় এবং আকবরের উত্তর ভারতের অভিজাতদের সঙ্গে আপোষ

১৫৫৬-তে আকবর হুমায়ুনের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে অঞ্চল পান, দিল্লী, আগ্রা, এবং পাঞ্জাবের কিছু অংশও তাঁর অন্তর্ভুক্ত(ছিল। বৈরাম খানের হাত ধরেই প্রথম বিস্তার নীতি শু(হয়। তাঁর অভিভাবকত্বাধীনে আজমীর,

গোয়ালিয়র এবং জৌনপুর অধিকৃত হয়। এই নতুন শাসকের অধিকারভুক্ত(হয় এক বিশাল অঞ্চল।

আকবর একটি যুদ্ধবিজয়ের নীতি প্রবর্তন করেন। যুদ্ধবিজয় নিয়ে তাঁর আদর্শ ছিল নিম্নরূপঃ "একজন রাজার উচিত সবসময়ই যুদ্ধে আগ্রহী হওয়া। নয়তো তাঁর শত্রুরাই তাঁর বি(দ্ধে বিদ্রোহ শু(করবে।" আবুল ফজল তাঁর যুদ্ধজয়ের পিছনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছেন। "(দ্র শাসকদের অপশাসনে জর্জরিত মানুষের জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসার ইচ্ছা।" এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও তাঁর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাল রেখে একটি সামরিক উদ্দেশ্যও ছিল। এটি ছিল সাম্রাজ্যের সীমাকে আরও বড় করা। তিনি বলেছেন "সৈন্যবাহিনীকে সবসময়ই যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত রাখা উচিত। পাছে অনুশীলনের অভাবে তারা সংযমহীন না হয়ে পড়ে।" মালবের বি(দ্ধে অভিযান (১৫৬১) থেকে শু(করে আসীড়গড়ের পতন পর্যন্ত (১৬০১) প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আকবর একজন বিজেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এর ফলে তিনি অত্যন্ত ফলপ্রসূ পুরস্কার পান। উত্তর ভারতে একমাত্র আসাম এবং দা(ণাত্যের কিছু অংশ বাদে সমগ্র ভারত আকবরের অধীনে আসে। ভিনসেন্ট স্মিথ যথার্থই বলেছেন, "শক্তি(শালী এবং বলিষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী যার সূর্যকিরণের সামনে লর্ড ডালহৌসীর তারকাদীপ্তি ম্লান হয়ে যায়। আকবরের নীতিতে কোনো অভিনবত্ব ছিল না। এ ছিল শেরশাহ ও দিল্লীর অন্যান্য শক্তি(শালী সুলতানদের দ্বারা অনুসৃত নীতিরই নবীকরণ। Sir Wolseley Haig এই সত্যের মধ্যে কোনো কিছুই খুব আশ্চর্যজনক খুঁজে পাননি যে, "একজন বিজেতার তাঁর প্রতিবেশী রাজ্যে হানা দেবার জন্য তাদের দখল করার ইচ্ছা ভিন্ন আর কোনো অজুহাতের প্রয়োজন হয় না।"

১৬০৫ সালে যখন আকবর মারা যান, তাঁর সাম্রাজ্য কাবুল থেকে আহম্মদনগর এবং বাংলা থেকে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। আকবর ব্যাপক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হলেও রাজ্যজয় না করে থাকতে পারেননি।

ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, "আকবর ছিলেন একজন সাধারণ সম্প্রসারণবাদী।" জিভি ম্যালেসন ও ভ্যান নোয়েরের মতে, "আকবর শুধুমাত্র প্রয়োজনের খাতিরেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন।" লরেন্স বিনিয়নের মতে, "তিমুরিদ আকবর ছিলেন একজন ঐতিহ্যগত সাম্রাজ্যবাদী। একই সময়ে তিনি নিরাপত্তার কারণেও যুদ্ধে লিপ্ত হন।"

আবুল ফজল যুদ্ধে মানবতাবাদ আনার চেষ্টা করেছেন। আকবরের যুদ্ধজয় ১৬৫১-৫২ সালে কেন্দ্রীয় রাজ্যের মধ্যবর্তী সমস্ত গু(ত্বপূর্ণ স্থান দখল করার মাধ্যমে সূচিত হয়। শু(থেকেই রাজ্যবিস্তারের (ে ত্রে তিনি তিনটি নীতি গ্রহণ করেন ঃ অঞ্চল অধিকার, বৈবাহিক মৈত্রী এবং কুটনৈতিক প্রচেষ্টা।

আকবরের রাজ্যজয় শু(হয় কিছু গু(ত্বপূর্ণ স্থানে, যেমন জৌনপুর, মীরাট, গোয়ালিয়র, চুনার, মির্থা এবং মালব ১৬৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

মহম আনাগার অভিভাবকত্বাধীনেই মালব জয় (১৫৬১) সম্পন্ন হয়। মালবের স্বাধীন সুলতান বাজবাহাদুর রাজনীতি ও যুদ্ধের প্রতি উদাসীন ছিলেন। সঙ্গীত ও আনন্দই তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আধাম খান ও পীর মহম্মদ খানের নেতৃত্বে তাঁর বি(দ্ধে একটি অভিযান চালানো হয়। বাজবাহাদুর মালবে ফিরে এসে তা পুর্নদখল করলেও মুঘল বাহিনী তাকে বিতাড়ন করতে স(ম হয়। এর ফলে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর দ(ন ক্লান্ত হয়ে ১৫৭০ সালে তিনি আকবরের কাছে আত্মসর্মপণ করেন। বৈরাম খানের পতনে উৎসাহিত হয়ে পূর্ব প্রদেশগুলির আফগানেরা এক বিশাল বাহিনী সংগঠিত করেন এবং জৌনপুরে অভিযান চালিয়ে লুপ্ত (মতা অধিকার করার প্রয়াসে ব্যর্থ হন। এর পরে চুনার দুর্গের আফগান প্রধান ১৫৬১ সালে শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসর্মপণ করেন।

১৫৬৪ সালে আকবর গন্ডওয়ানা জয় করেন। তিনি আসফ খানকে গড় কাটাঙ্গাঁর গোন্ড রাজ্যকে পরাজিত করার নির্দেশ দেন, যা আগে কখনই বশ্যতা স্বীকার করেনি। নাবালক রাজা বুই নারায়ন ও তার মা রানী দুর্গাবতী বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন এবং এক সাহসী প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর রাণী আহত হয়ে পড়েন। দু'মাস পরে আসফ খান চুনারের দিকে এগিয়ে যান ও তা দখল করেন।

সমস্ত রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে চিতোর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিল। এটি আকবরের

"স্বর্ণমন্ডিত শিকলের" দ্বারা আবদ্ধ হতে অস্বীকার করেছিল। রাণা উদয় সিংহ আকবরের বশ্যতা মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। তিনি অম্বরের রাজার কন্যার সঙ্গে আকবরের বিবাহকে হিন্দু ধর্মের লঙঘন হিসাবেই দেখেছিলেন। এ ছাড়াও, মেবারকে তাঁর সাম্রাজ্যের ক(পথে নিয়ে আসার পেছনে গভীর-সামরিক এবং রাজনৈতিক কারণও ছিল। তিনটি শক্তি(শালী দুর্গ, মারওয়াড়ের মীর্থা, বুঁদির রনথম্ভোর এবং চিতোর রাণার বিচারাধীন এলাকাতেই পড়ত। উপরন্তু মেবার গুজরাটে যাবার পথেই পড়ত। চিতোরের দুর্গ নিজের দখলে না এলে, গুজরাটের মত একটি ধনী প্রদেশকে কিছুতেই নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা যেত না। এই প্রসঙ্গে যে অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতার আশ্রয় তিনি নিয়েছিলেন তাতে আকবরের নামে এক অনপনেয় কলঙ্ক লেগেছিল। আবুল ফজল অবশ্য এই কথা বলে ব্যাপারটাকে সমর্থনের চেষ্টা করেছেন যে, অসামরিক জনগণও আত্মর(ার লড়াইতে অংশগ্রহণ করেছিল। এর ফলে মেবারের সমতলভূমি মুঘল নিয়ন্ত্রণে আসে। এটি গুজরাট জয়ের পথ থেকে একটি বাধা অপসারণ করে এবং রণথম্ভোরের দ্রুত পতন (১৫৬৯) ঘটায়। মেবার ও বিকানীর বশ্যতা স্বীকার করে (১৫৭০)। রাণা প্রতাপ সিংহ হলদিঘাটের প্রান্তরে ১৫৭৬ সালে এক চূড়ান্ত পরাজয়ের সম্মুখীন হন। এটি ছিল মুঘলদের একটি নিষ্ফলা বিজয়। ১৫৭৮-এ কুম্ভলগড় দখল করা হয়। আকবর কয়েকটি অভিযান পাঠান এবং মেবার বিধ্বস্ত হয়। রাণার মৃত্যুর পর চিতোর এবং মন্ডলগড় ছাড়া সমগ্র মেবারের ওপর আকবর প্রভুত্ব পান। রণথম্ভোর, কালিঞ্জর এবং মারওয়াড় ছিল বিজিত এলাকার অধীন। মারওয়াড়কে তিনটি নীতির মধ্যে যে কোনো একটির অধীনে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছিল।

ওই সময়ের মধ্যে গুজরাট জয়ও সম্পন্ন হয়েছিল। মালব বিজয়ের পর এবং রাজস্থানের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর আকবরের অগ্রগতির পথে গুজরাট উন্মুক্ত(হয়ে পড়ে। এটি ছিল একটি ধনী রাজ্য যার অধীনে কয়েকটি বন্দর ছিল। সুরাট ও কাম্বেতে ভারতীয় ও বিদেশী বহু ধনী ও প্রভাবশালী বণিক বাস করত। আত্র(মণকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে গুজরাটের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল আত্র(মণের প(উপযোগী। বিশেষ (মতাবান কোনো সুলতান গুজরাটের সিংহাসন দখল করেননি। বহু বছর ধরে অসৎ অভিজাতরা সুলতানদের মসনদে বসিয়েছিল ও নামিয়েছিল এবং দেশটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল। এটি ছিল এক বাণিজ্যকেন্দ্র এবং ট্রান্স-অক্সিয়ানা, তুর্কী ইত্যাদির সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল। ইত্যবসরে মির্জারা গুজরাটে শাসন চালাত। কাম্বে থেকে আকবর তাদের বি(দ্ধে যাত্রা শু(করেন এবং তাদের সারমলের যুদ্ধে (১৫৭২) পরাজিত করেন। যুদ্ধে বিজয়ের পর সুরাট দখল সম্পন্ন হয়। গুজরাটে আবার নতুন করে বিদ্রোহ শু(হয় এবং আকবর ঝড়ের গতিতে আহমেদাবাদের দিকে ধাওয়া করেন ও সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করেন। এর ফলে রাজকীয় কোষাগারে বিপুল অর্থাগম হয়।

১৫৭৫-৭৬ সালে বাংলা জয় করা হয়। শূরেরা আকবরের সিংহাসনারোহনের সময় বাংলা অধিকার করেছিল এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। ষাটের দশকের মাঝামাঝি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গড়ে ওঠা রাজ্যে সুলেমান কাররানী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট বিচ(ণ হবার কারণে তিনি আকবরের কর্তৃত্ব মেনে নেন এবং তার নামে খুৎবা পাঠ করে এবং সময়ে সময়ে উৎকোচ প্রদান করে আকবরকে খুশী রাখেন। কিন্তু পরে পুত্র দাউদ অবাধ্যতা প্রদর্শন করলে আকবর দাউদকে শাস্তি দিতে আদেশ করেন। তিনি ব্যক্তি(গতভাবে বিহারের দিকে অগ্রসর হন। স্থলপথে এক বিশাল বাহিনী অগ্রসর হয় ও পাটনা দখল করে। আকবর বিপুল লুণ্ঠিত ধনরত্ন ও ২৬৫টি হাতি নিয়ে রাজধানীতে ফেরেন। সুরযগড়, মোঙ্গীর, ভাগলপুর ও কোলগাঙ্গঁ পরপর অধিকৃত হয়। দাউদ উড়িষ্যায় পালিয়ে যান। মুঘল বাহিনী উত্তর ও পশ্চিম বাংলার বেশ কিছু অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। বিজ্ঞানসম্মত সীমানা সৃষ্টি করতে ১৫৭৫ সালে কা(্মীর জয় করা হয়। ইউসুফ খান নামে এক স্বাধীন শাসকের বি(দ্ধে অভিযান চালানো হয় এবং তাকে কা(্মীরের সামন্ত প্রভু হিসাবে স্বীকৃতি দান করে একটি চুক্তি(সম্পাদিত হয়। ১৫৮৬ সালে কা(্মীর দখল করা হয়। ওই বছরই বালুচিস্তানও জয় করা হয়। বালুচিস্তান দখল করার জন্য আকবর একটি অভিযান চালান এবং বালুচি প্রধান বশ্যতা স্বীকার করেন। আকবর তাদের সামন্ত প্রভু হিসাবে স্বীকৃতি দেন এবং

বালুচিস্তানকে তাদের অধীনে থাকতে দেন। ১৫৯২ সালে সিন্ধু, ১৫৯৫ সালে কান্দাহার এবং ১৫৯১-৯২ সালে সৌরাষ্ট্র অধিকৃত হয়।

আকবর তাঁর প্রথম নীতির প্রয়োগ ঘটান দা(ণাত্যে। দা(ণাত্যেই প্রথম তিনি রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ছাপ রাখেন। ভ্যান নোয়ের আরও বলেন, মুঘল অধিকার থেকে ছিটকে যাওয়া আকবর তাদের পর্তুগীজ সিল্ক (টের ওপর দখল পাবার জন্যই সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং সুতরাং একটি নির্গমণপথ চেয়েছিলেন।

ব্যতিত্র(ম হিসাবে বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য বাদে দ(ি ণ ভারত কখনই সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল না। উত্তর ভারতে মুসলিমরা বাদে রাজপুতরা ছিল একটি গু(ত্বপূর্ণ গোষ্ঠী। রাজপুতনীতিকে একটি স্বতন্ত্র নীতি হিসাবে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। রাজপুতরা কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যের আওতায় আসতে অনিচ্ছুক ছিল।

রাজপুতদের প্রতি আকবরের ব্যবহার অপরিণামদর্শী আবেগ বা তাদের সাহস, দয়া বা দেশপ্রেমের প্রতি বীরধর্মপূর্ণ শ্রদ্ধার প্রকাশ ছিল না। এটি ছিল একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নীতির পরিণতি। এই নীতি জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থমনস্কতা, গুণের কদর, ন্যায়বিচার এবং সুব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। আকবর তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকেই বুঝতে পেরেছিলেন, যেহেতু তাঁর মুসলিম কর্মচারী এবং অধীনস্থরা সকলেই বিদেশী ভাড়াটে সৈন্য, কাজেই প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারেই কাজকর্ম করতেন, সুতরাং তাদের ওপর নির্ভর করা চলত না। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের দিন থেকেই তাঁকে নিজের দরবারে বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শাহ আবদুল মোলি, শাহ মনসুর থেকে শু(করে অনেকেই এই তালিকার অর্ন্তভুক্ত(ছিলেন। এমনকী বৈরাম খাঁও সার্বভৌম (মতার বি(দ্ধে বিদ্রোহ করেন। এর পরে মহম আনাগাও চূড়ান্ত অনৈতিক ও স্বার্থপররূপে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। যাদের ওপর নির্ভর করে বিদেশী মাটিতে অচেনা জনসাধারণের ওপর মুঘল কর্তৃত্ব গড়ে উঠেছিল, প্রায়ই তাদের দ্বারা সংগঠিত বিদ্রোহের ফলে আকবর বোঝেন যে, তাঁর শাসন ও বংশকে স্থায়িত্ব দিতে হলে এই দেশের জনসাধারণের গু(ত্বপূর্ণ গোষ্ঠীদের কাছ থেকেই সমর্থন খুঁজতে হবে। যা তাঁর পিতা বা পিতামহ দেখতে পারেননি, আকবর তাঁর বিচ(ণতার দ(ণ দেখতে পেয়েছিলেন যে রাজপুতদের অধীনে বিশাল এলাকা থাকা ছাড়াও তাঁরা ছিল বিশাল সৈন্যবাহিনীর কর্তা এবং প্রতিশ্রুতির(া ও বীরত্বের জন্য বিখ্যাত। এদের ওপর নিশ্চিতভাবে ভরসা করা চলত এবং তাদের মিত্রে রূপান্তরিত করা সম্ভব ছিল। সুতরাং তিনি তাদের সহযোগিতা পেতে চান এবং স্বার্থান্বেষী মুঘল, উজবেগ, পারসিক এবং আফগান অভিজাত ও কর্মচারীদের বি(দ্ধে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার কাজে লাগাতে চান। এই নীতি অনুসরণ করে তিনি অম্বরের রাজা ভারমলের বশ্যতা স্বীকারকে মেনে নেন এবং ১৫৬২ সালে কাছুওয়াহা শাসক বংশের সাথে এক বৈবাহিক সম্বন্ধে লিপ্ত হন। তাঁর কাজকর্মের (ে ত্রে তিনি ভগবন্ত দাস ও মান সিংহের সাহায্য পান। শীগগিরই তিনি দেখতে পান যে তাঁরা অধিকাংশ উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারীদের থেকে অনেক বেশী অনুগত এবং সেবাপরায়ণ। তিনি চেয়েছিলেন সবচেয়ে উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারী ও সেনাধ্য(দের সঙ্গে সমমর্যাদার ভিত্তিতে অন্যান্য রাজপুতদেরও তাঁর কাজের আওতায় আনতে।

আকবর শাসক শ্রেণীর বেশ কাছাকাছি অবস্থান করতেন। আকবর ও অন্যান্য শাসক গোষ্ঠী রাজস্বের ওপর যথেষ্ঠ নির্ভরশীল ছিলেন, কেননা মধ্যযুগে তা ছিল যথেষ্ট গু(ত্বপূর্ণ। শাসকগোষ্ঠী একটি অনুৎপাদক শ্রেণী হবার দ(ণ তাদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ওপর নির্ভর করতে হত। আকবর এদিকে জিজিয়াও বিলোপ করেছিলেন। ইকতাদার আলম খানের মত ঐতিহাসিকেরা আকবরকে 'এপিসোডিক' (episoadic) বলে বর্ণনা করেছেন। সাম্রাজ্যের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বহুমাত্রিক।

আবুল ফজল হয়তো কিছুটা অতিরঞ্জিত করে বলেছেন। এটা হয়তো অতটা গু(ত্বপূর্ণও কিছু ছিল না। অন্যদিকে আকবর তার রাজত্বের প্রথম কয়েক বছর বেশ কঠোর ইসলামীয় নীতি গ্রহণ করেছিলেন, যা বুন্দেলখন্ড বা চিতোরে ল(্য করা যায়। তিনি জিজিয়া বিলোপ করেন, কিন্তু চিতোর যুদ্ধের সময় ধর্মের নামে "জিহাদ" ঘোষণা করেন।

১৫৬৮ সালে চিতোরের পতনকে "বিধর্মীদের বিনাশ" হিসাবে ঘোষণা করা হয়। আসলে রাজত্বের শু(র দিকে আকবর একমুখীভাবে তাঁর নিজস্ব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি মেনে চলতে পারেননি। এও ল(্য করা গেছে যে, আকবর অনেক (ে ত্রেই তাঁর দরবারের সুন্নী গোষ্ঠীর বাকরীতি দ্বারা পরিচালিত হতেন। আকবর রাজনৈতিকভাবে সুস্থিত ছিলেন না এবং তাঁর সামরিক নীতি মনসবদারী ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি সৈন্যবাহিনীকে নিশ্চিত ও স্থায়িত্ব দিতে পেরেছিলেন। তিনি কেন্দ্রীকরণ আনতেও চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সুশৃঙ্খল করার (ে ত্রে তিনি (মতাশালী গোষ্ঠীর কাছ থেকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এর ফলে, তুরানী অভিজাতরা সম্রাটের বি(দ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সৈন্যবাহিনীর কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন আরও বেশী করে অনুভূত হয়। এবার তিনি অপে(াকৃত কম গু(ত্বপূর্ণ শেখজাদা ও রাজপুতদের তাঁর প্রশাসনে উচ্চতর স্থান দিতে চান। কিন্তু রাজপুতরা এতে যোগদান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

আকবরের যাবতীয় নীতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও অধীনস্থদের জড়ো করবার উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়েছিল। কূটনীতির (ে ত্রে আকবর কোনো একরৈখিক পথে চলতে পারেননি। মূলতঃ সুন্নী নেতা মুকাদ্দম-উল-মুল্‌ক্ এবং আবদুল নবীর কথাই মেনে চলতেন, যদিও তিনি তাঁদের কথা উপে(া করার মত শক্তি(র অধিকারী ছিলেন। এই কারণেই তিনি জিজিয়া বিলোপ করেন। তিনি সুফী তীর্থ(ত্রগুলিও পরিদর্শন করতে যান। আবার অন্য দিকে চিতোরের বি(দ্ধে যুদ্ধকে তিনি জিহাদ বলে বর্ণনা করেন। আকবর একজন বিশাল মাপের কূটনীতিবিদ হওয়ায় তিনি সময়ের দাবীর সঙ্গে আপোষ করতে পেরেছিলেন এবং সেই কারণেই একজন সম্রাট হিসাবে তিনি সফল। একজন অসাধারণ যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও তিনি বৈবাহিক সম্পর্ককে গ্রহণ করেছিলেন। আকবরের সময়ে সং(-ষণ ও আত্তীকরণও যথেষ্ট গু(ত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

যখন সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ব্যাপারে অঞ্চলের প্রসার জ(রী হয়ে পড়ে, বশ্যতা মানার প্র(াটি তখন অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মুঘলদের রাজত্বকালে এক ব্যাপক অঞ্চলে বংশানুত্র(মিক রাজা, রাণা, রাওয়াত ইত্যাদি স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন প্রধানরা রাজত্ব করতেন। এদেরকে একত্রে জমিদার বলা হত যারা কর আদায় করত। এরা ছিল বংশানুত্র(মিক ও হিন্দু। আকবরকে তাদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। একদল বংশানুত্র(মিক জমিদার মুসলিম জাগীরদারদের দ্বারা অপসারিত হয়েছিল এবং তাদের সংঘাত এক ধর্মীয় আকার ধারণ করে। আকবর আসলে তাদের সঙ্গে সমঝোতা করে নিতে চেয়েছিলেন এবং প্রধানদের সাথে তাদের প্রাথমিক সংঘর্ষের পর তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন। তিনি রাজপুতদের মধ্যে সাম্রাজ্যের ধারণা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ একদল জমিদারের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে তিনি পাঞ্জাবে সিকান্দার খান শূরের বি(দ্ধে যুদ্ধ চালান। তিনি একটি নতুন সামাজিক স্তর সৃষ্টি করেন এবং ১৫৭৮ সালে লাহোর সুবায় টোডরমলকে নিয়োগ করেন। সুতরাং পাঞ্জাব-লাহোর নেতা আকবরের প্রাধান্য মেনে নিতে বাধ্য হন। কাছাকাছি সুবাগুলির মধ্যে আকবর আফগান এবং দিল্লী, আগ্রা, অযোধ্যা এবং এলাহাবাদের বিদ্রোহী অভিজাতদের বি(দ্ধে লড়াই করেন। এই যুদ্ধের সময় তিনি কিছু নিম্নশ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসেন যারা তাঁকে ভট্টের রাজা রামচন্দ, রাজা মনসর চন্দ, গোন্ডের রাজা মান প্রমুখের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে সাহায্য করে। এইভাবে তিনি প্রাধান্য লাভে স(ম হন। মুঘলরা প্রায়ই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে (তিগ্রস্ত হত মুঘল রাজার মৃত্যুর পর। আকবর সংহতি সাধনের চেষ্টা করেন কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দ(ণ স্থানীয় প্রধানরা কেন্দ্রীয় সরকারের বি(দ্ধে আন্দোলন শু(করে। কেন্দ্র ও সীমান্তের মধ্যে সংঘর্ষ চলতেই থাকে। বিহারে আনন্দ চেরো নামে এক উপজাতীয় প্রধানকে আফগানরা অপসারণ করে। রাজপুতানার রাজা বিহারীমল অর্ন্তদ্বন্দ্বের ফলে আকবরের কাছে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। চন্দ্রসেনের কাছ থেকে যোধপুর জয় গায়ের জোরেই করা হয়েছিল। বৈরাম খানকে আশ্রয় দেবার কারণে বিকানীর আত্র(মণ করা হয় এবং পরে কল্যাণমল মনসবদার হিসাবে মুঘলদের প(অংশ নেন। জয়সলমীরও ওই একই পথ অনুসরণ করে। কিন্তু মেবারের রাণা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে চাইলেন না।

মালবের রাজা বাজবাহাদুর রাণী রূপমতীর সাথে পালিয়ে গেছিলেন। আকবর বলপ্রয়োগের রাস্তা ছেড়ে কূটনীতির পথ গ্রহণ করেন এবং তিনি এ(ত্রে কিছু নিচু জমিদার শ্রেণীর কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটান। আকবরের প্রধানদের বি(দ্ধে প্রাথমিক বিজয় আংশিক বা সম্পূর্ণ বশ্যতার বিনিময়ে শেষ হয়। এই প্রণালী দরবারের উপশাসক গোষ্ঠীর সহায়তায় আফগানদের বি(দ্ধে চালিত সামরিক অভিযানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। একবার আফগান ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের দিক থেকে ভয় কমে যাবার পর রাজপুত প্রধানরা এক বড়সড় চিন্তার কারণ হয়ে ওঠেন।

সতীশ চন্দ্র যুক্তি(পেশ করেছেন যে, রাজপুতদের সঙ্গে মুঘল সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে দেখা উচিত নয়, বরং দেখা উচিত সংঘাতের এক অংশ হিসাবে যার প্রচুর পূর্ববর্তী ইতিহাস ছিল। দিল্লীর সুলতান শাহীর পতনের পর এবং রাজস্থান, গুজরাট, মালব ইত্যাদি অঞ্চলে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠা, যেমন রাণা সংগ্রাম সিংহ এবং রাণা কুম্ভের উত্থানের সময় থেকে এই ইতিহাসকে টানা যায়। তিনি রণকৌশলের (ত্রে এইসব অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থানের গু(ত্বকেও তুলে ধরেছিলেন। বাহাদুর শাহ, শের শাহের এদের মৃত্যুর পর আফগানদের পতনের পর রাজপুতরা প্রচারের কেন্দ্রে আসে। সতীশ চন্দ্র যুক্তি(দেখিয়েছেন যে যেহেতু আফগানদের প্রচারের আলো থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাজপুতরা সেহেতু ভৌগলিক দিক থেকে যথেষ্ট গু(ত্ব লাভ করে। বাহাদুর শাহের পতন মধ্য, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের হিন্দুদের মধ্যে একতা নিয়ে আসে এবং রাজপুত জোট গঠিত হয়।

সতীশ চন্দ্র আকবরের রাজপুত নীতিকে একরৈখিক এবং তিন স্তর বিশিষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। প্রথম পর্বটি হল যখন আকবর বিহারীমলের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তার নিজের রাজনীতির ওপরেই তখন তার খুব দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, তিনি আসলে মেবারের বি(দ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং একে জিহাদ বলেছিলেন। সেখানে কোনো উদার নীতি ছিল না।

তৃতীয় পর্যায়ে আকবর কাছুওয়াহার রাণা ভগবান দাস এবং মানসিংহের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। এই শেষ পর্যায়ে আকবরের রাজপুত নীতি এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছয় যাতে গোঁড়া মুসলিম ধর্মীয় প্রতিনিধিদের সম্মতি ছিল না। আকবর এমন কিছু উদারনীতির প্রবর্তন করেন, যাকে উলেমারা সমর্থন করেনি। আবুল ফজল এই বিষয়টির উপর অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। রাজনৈতিকভাবে আকবর ছিলেন শক্তি(মান ও তিনি গোঁড়া উলেমাদের উপে(া করতে পারতেন। রাজপুতদের সাথে তার নতুন সম্পর্ক তাঁকে মির্জা, কোকা ইত্যাদি জাতিকে হারাতে সাহায্য করে। এই মৈত্রী ১৫৮৪ সালে ভগবন্ত দাসের কন্যা মান বাই ও সালিমের মধ্যে বৈবাহিক বন্ধন হিসাবে প্রকাশিত হয়। অন্য অনেক ভাবেও আকবর তার উত্তরাধিকারীদের রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রী অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। ১৫৮৩-৮৪ সালের মধ্যে আকবর বেশ কিছু 'অনুগত' হিন্দুকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে প্রশাসনের কাজকর্মে নিযুক্ত(করেন। যেমন টোড়রমল, মান সিং প্রমুখ। আবুল ফজল এই ঘটনাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেননি। এই নীতি কিভাবে জ্ঞানদীপ্তির সাথে সম্পর্কিত সে বিষয়ে আবুল ফজল নীরব।

রাজার ঠিক পরবর্তী স্তরের অধস্তন কর্মচারীরা উপে(ত হয়। যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমানরা সরাসরিভাবে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত(নয়, শুধুমাত্র তাদেরই অধিক গু(ত্ব দেওয়া হয়। স্থানীয় রাজারা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে শক্তি(শালী হয়ে ওঠে। তার ফলে তাদের প(বিদ্রোহ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

এস. ইনায়ৎ. এ. জাইদি আকবরের সময়কার সরকারী সূত্র আকবর-নামা এবং আইন-ই-আকবরীর অভিজাত এবং নির্ভরশীলদের বাদ দিয়ে সমগ্র জনসংখ্যাকে উপ-শাসক শ্রেণী এবং প্রজা, এই দুই ভাগে ভাগ করার ঝোঁকের ওপর আলোকপাত করেছেন। প্রথমদলকে জমিদার, মারজবানান এবং আকওয়ান এবং শেযোক্ত(দের রাইয়ত্ত এবং মারদুন বলা হয়েছে।

অভিজাতবর্গকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়নি এবং এই অভিজাতবর্গের কোনো ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ছিল না। একজন

সম্রাট হিসাবে উভয় শ্রেণীর স্বার্থ দেখাকেই আকবর নিজের দায়িত্ব মনে করেছিলেন। প্রথম শ্রেণীর প্রতি তাঁর চিন্তা শাসকশ্রেণীকে মুঘল রাজকীয় ব্যবস্থার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করার পথে চালিত করেছিল। একদিকে স্বাধীন শাসকদের পরাজিত করে আকবর স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির (মতা খর্ব করেছিলেন। অন্যদিকে রাজকীয় শাসক শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত(করিয়ে তিনি এঁদের সম্মান বৃদ্ধি করেন। এইভাবে আকবর মুঘল রাজকীয় ব্যবস্থার সঙ্গে একটি নতুন শাসক গোষ্ঠীকে একাত্ম করতে চান। আকবরের পূর্বপু(যদের থেকে এটি ছিল একটি বিচ্যুতি এবং এর ফলে ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে জাতীয়তাবোধের এক আদি রূপের সৃষ্টি হয়। একজন স্থানীয় প্রধানকে বশ মানানো, তাঁর কাছ থেকে প্রচুর পেশকাশ (রাজকর) আদায় ও পরে তাঁকে তাঁর অঞ্চলে মুক্ত(ছেড়ে দেওয়া— এখন থেকে এটাই চিরাচরিত রীতি হয়ে দাঁড়ায়। এইসব প্রধানদের রাষ্ট্রকে সামরিক দলপতি হিসাবে সেবা করার সুযোগ দিয়ে ও ইরানী ও তুরানী অভিজাতদের সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়ে তিনি তাদের মূল মঞ্চেনিয়ে আসেন। দেওয়া ও নেওয়া নীতির মাধ্যমে আকবর এইসব প্রধানদের স্বার্থকে রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত(করেন। আকবর এবং আফগান ও রাজপুতরা একই শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত(হলেন। যারা রাজকরের উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। সম্রাট ও স্থানীয় প্রধান উভয়েই রাজকীয় জাগীর (zagir) যা সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়াতে সাহায্য করেছিল, তাঁর মাধ্যমে কৃষককে শোষণ করার জন্যই কাজ করেছিলেন।

পেশকাশ আদায় করার ও যখনই দরকার তখনই সামরিক সেবা দাবী করার পূর্বেকার নীতি শুধু যে স্থানীয় শাসকদেরই প্রচন্ড (তি করছিল তাই নয়, তাদের রাইয়ত, যারা করের বোঝা বয়ে বেড়াত, তাদেরও অভূতপূর্ব (তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেই কারণে প্রধান ও তাঁর প্রজাদের স্বার্থও ছিল অনেকটা একইরকমের। তারা উভয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের বোঝাকে ঝেড়ে ফেলতে আগ্রহী ছিল। ষোড়শ শতক নাগাদ দেশজ শক্তি(গুলির মধ্যে রাজপুতরা একটা শক্তি(শালী স্থান অধিকার করেছিল। সৈন্য ও যুদ্ধের পশুর সংখ্যা অনুযায়ী তাদের সামরিক সম্ভাবনার সন্ধান পেয়ে আকবর তাদের মুঘল শাসক শ্রেণীতে নিযুক্ত(করেন। তিনি মুঘল বাহিনী শুধুমাত্র প্রধানদের কাছেই উন্মুক্ত(রাখেননি। অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর নেতৃবর্গের কাছেও তা উন্মুক্ত(ছিল। তাদেরকেও মনসব দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের প্রধানদের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল যা শুধুমাত্র মনসবের শ্রেণীত্র(মের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। এইসব নবনিযুক্ত(প্রধানদের তাদের প্রাপ্ত মনসবের ভিত্তিতে সামরিক বাহিনী ও পশু বাহিনী র(া করতে হত। ফলতঃ গোড়ার দিকে বিশাল সংখ্যক মানুষ ছিলেন কৃষক-যোদ্ধা, ভূমি থেকে তাঁদের আয় ছাড়া মুঘল মনসবে সামরিক সেবার মাধ্যমেও তারা উপরি আয় করতে থাকেন। এইভাবে সাম্রাজ্যের প্রতি সেবার মাধ্যমে রাজপুত প্রধান ও তাঁর অধীনস্থ সৈন্যরা তাঁদের অঞ্চলে বেশ কিছু ধনরত্ন জমা করতে স(ম হন। আকবর এই রাজপুত প্রধানদের অভিজাতবর্গের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দেন। তিনি তাদের উচ্চ প্রশাসনিক পদ যেমন স্বদর (রাজ্যপাল), ফৌজদার (সেনাধ্য( ), দিওয়ান (রাজস্ব আধিকারিক), কিলাদার ইত্যাদি পদে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করেন। রাজপুত প্রধানদের রাজকীয় চাকরীতে নিয়োগ করার ে(ত্রে আকবর প্রথমদিকে চিরাচরিত নীতিরই প্রয়োগ ঘটান। একজন প্রধানের বশ্যতা স্বীকারের পর তাঁর এলাকা তাঁকেই এই শর্তাধীনে ফিরিয়ে দেওয়া হত যে দরকারে তিনি সামরিক সাহায্য দেবেন। নিজেদের প্রধানদের সাথে সংঘর্ষের পরে যেসব রাজপুতরা আকবরের চাকরীতে যোগ দিতেন, তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে অবশ্য এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হত না। বিকল্প একটি পন্থা ছিল মুখ্য প্রধানের কাছ থেকে কিছু এলাকা ছিনিয়ে নিয়ে তা অন্যান্য রাজপুত অভিজাতদের জাগীর হিসাবে দান করা। যেহেতু কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট পদ কিছু অভিজাতদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, তাই রাজপুত প্রধান ও তাঁদের আত্মীয়দের যে জাগীর দেওয়া হত, তা যথেষ্ট গু(ত্ব লাভ করেছিল। এখন যেসব রাজপুত প্রধানের দেওয়া মোট বেতনের পরিমাণ তাঁদের রাজত্বের জমা হিসাবের চেয়ে বেশী হত, তাঁদের সাম্রাজ্যের অন্য অংশ কিছু জাগীর দেওয়া হত। এর উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৫৭৩ সালে মানসিংহ মালবের খিচিওয়াড়া জাগীর হিসাবে পেয়েছিলেন। আকবর ও কিছু ছোট রাজপুত রাজ্যের উপরেও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ

স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে রাও মালদেওয়ের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে আকবর যোধপুরকে সরাসরি রাজকীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনেন। আকবর তাঁর অভিজাতদের মনসব স্থির করেন এবং দাগ ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি নতুন করে রাষ্ট্রের জমা নির্ধারণ করে দেন, যাতে মনসবদার ও সৈন্যদের বেতন দিতে পারেন। ১৫৯২-৩ সালে, উত্তরাধিকারের প্র(তিনি ভট্টকে প্রত্য(শাসনের অধীনে আনতে চান। আকবর মধ্যপদস্থ জমিদারদের সাথেও বন্ধুত্ব করতে চান। এটি (মতার ভারসাম্য বজায় রাখে এবং পরো(ভাবে সাম্রাজ্যকে এক শক্তি(দান করে। মুঘলদের অনেক রকমের ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল কিন্তু আকবরকে তার জন্য দায়ী করা যায় না। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন সাম্রাজ্য ও দরবারী রাজনীতির সংঘাতের জন্য ঘটেনি, ঘটেছিল সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির জন্য। কেন্দ্রীয়তাকে এই পতনের জন্য দায়ী করা যায় না।

রাজপুতরা সর্ববৃহৎ মনসবদারীর অধিকার পান এবং আকবর আসলে তাঁদের খুশী করতে চেয়েছিলেন, যেহেতু তাঁরা মুঘল চাকুরীতে যোগ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। রাজপুত রাজ্যগুলির দখলেই ওয়াতনগুলিকে ছেড়েছিলেন। শু(র দিকে তিনি প্রত্যেক রাজপুত প্রধানকে বংশানুত্র(মিক খেতাব-রাও, রাজা এবং দুর্গগুলিকে দিতেন। একে তাঁর বংশানুত্র(মিক অধিকার হিসাবে সম্রাট স্বীকৃতি দেন। অনেক প্রধানের অঞ্চলই আগে অভিজাতরা ভোগ করতেন এবং সেগুলিকে খালিসার অন্তর্ভুক্ত(করা হত। এর ফলে মুঘল শক্তি(র ওপর ভিত্তি করে স্থানীয় একতা গড়ে ওঠে। মুঘল সাম্রাজ্যের অনুশাসনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় আনুগত্য গড়ে ওঠে। এটি মক্কেল-মু(ব্বী সম্পর্ক নামে পরিচিত। প্রধানদের এলাকা থেকে ঠিকানাদার, পাওনাদার ইত্যাদি পদের বহু লোককেও সরাসরি মুঘল রাজকীয় শাসনের অধীনে গ্রহণ করা হয়। এই পদগুলিকে পূর্ববর্তী প্রধানের থেকে স্বতন্ত্র নিয়োগ হিসাবে গণ্য করা হয়। এর ফলে গোষ্ঠী মৈত্রীসঙ্ঘ ভেঙে পড়ছিল এবং বৃহৎ জমিদারদের (মতা খর্ব হচ্ছিল। এইবারে প্রধানদের বদলে উপপ্রধানেরা সরাসরি সাম্রাজ্যের প্রতি কৈফিয়ৎযোগ্য হলেন। এটি (মতার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এই স্বত্বনিয়োগগুলি যা প্রধানরাই করতে পারতেন তা সাধারণ জাগীরের থেকে আলাদা ও অহস্তান্তরযোগ্য প্রকৃতির ছিল।

১. ওয়াতন জাগীর চিরস্থায়ী ভিত্তিতে দান করা হত।

২. সম্রাট তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সাম্রাজ্যের কোনো স্থানে যে কোনো অভিজাতের জন্য ওয়াতন জাগীর সৃষ্টি করতে পারতেন।

৩. যে অভিজাতকে ওয়াতন জাগীর দেওয়া হবে, আশা করা হত ওই স্থানের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক থাকবে।

৪. আকবর বুঝেছিলেন রাজপুত প্রধানদের তাদের পৈত্রিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে সংযুক্ত(করতে পারলে স্থানীয় আনুগত্যকে শক্ত(করা হবে কিন্তু পিতৃপু(যদের জমি থেকে দূরে ওয়াতন জাগীর সৃষ্টি করতে পারলে ওই প্রধানদের ও সাম্রাজ্যের স্বার্থের মিলন ঘটবে। যেহেতু প্রধানরা মুঘলদের কাজে যোগ দিয়েছিলেন এবং যেহেতু তাদের মনসব দেওয়া হয়েছিল তারা সহজেই জাগীরের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পেয়েছিল। এর থেকে একটা অংশ সর্বদাই তাদের ওয়াতনের দাবী হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল। সুতরাং ওয়াতনের রাজস্ব তাঁদের বেতনের অংশ ছিল। এই বন্দোবস্তের প্রকৃতি সাধারণ জাগীরের মতই ছিল। শুধু এটির ছিল অ-হস্তান্তরযোগ্য। ওয়াতন জাগীরের (ে ত্রে রাজস্বের পরিমান নির্ধারিত ছিল না এবং এটির সময়ে সময়ে পরিবর্তনও হত। সুতরাং আকবর পিতৃপু(যদের জমির সঙ্গে রাজপুতদের আবেগের সম্পর্ক বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই কারণেই অপ্রয়োজনীয় ভাবে জমি থেকে উৎখাত থেকে দূরে থাকতেন। তাসত্ত্বেও তিনি তাঁদের রাজ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংহত করেছিলেন। অন্যত্র বড় জাগরী বা প্রশাসনিক পদের লোভ দেখিয়ে প্রধানদের সঙ্গে অনেক সময় সমঝোতাও করে নেওয়া হত। এর ফলে স্বয়ং রাজপুত প্রধানদের মধ্যেই সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেখা দিয়েছিল। তাদের নজর এখন স্থানীয় স্বার্থ থেকে আমলাতান্ত্রিক উচ্চাকাঙ(ার দিকে যায় এবং এর ফলে রাজপুত প্রধানদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য দেখা দেয়। রাজস্থানের রাজপুত প্রধান এবং পূর্ব

ও মধ্য ভারতের প্রধানরা একে অপরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। রাজপুত জাগীরদাররাও অনেক স্থানীয় লোকেদের নিজেদের অধীনে নিযুক্ত(করেন। এদের মধ্যে অনেকেই পিতৃভূমির সঙ্গে সংযুক্ত(হয়ে পড়েছিলেন এবং এখানেই বসতি স্থাপন করেন। আকবরের রাজপুতনীতি ভৌগোলিক ধারণায় রাজনৈতিক পরিচয় স্থাপনের ((ত্রে একটি বড় পদ((প। এটি আদি জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির ((ত্র সৃষ্টি করেছিল এবং সাম্রাজ্যের সংযুক্তি(ও সংহতিকরণ ঘটিয়েছিল।

এর ফলে রাজপুতরা মুঘল শাসনের কট্টর সমর্থকে পরিণত হন এবং দেশব্যাপী তাকে বিস্তৃত করার ((ত্রে এক কার্যকর ভূমিকা নেন। সামরিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শৈল্পিক উন্নতির ((ত্রে তারা দরাজভাবে ও প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করেন। তাদের সহযোগিতা শুধু যে মুঘল শাসনকে নিরাপত্তা এবং স্থায়িত্ব দেয় তাই নয়, দেশে এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক পুন(জ্জীবনের এবং সাংস্কৃতিক নবজাগরণও ঘটায়। হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় মুঘল রাজত্বের এক অমূল্য প্রাপ্তি।

৩.২ আকবরের ধর্মীয় নীতি

আকবর যে ধর্মীয় নীতির প্রচলন করেছিলেন, তাকে আদৌ আধুনিক ভারতের ধর্মনিরপে(নীতির অগ্রদূত বলা যায় কিনা, তা তর্কসাপে(, এবং এই বিতর্ক জোরালো হয়ে ওঠে সমকালীন ইতিহাসবিদদের বিভিন্ন মতবাদের দ(ন। আকবর-এর সমসাময়িকদের মতে ওঁর দর্শন মূলতঃ তৎকালীন দার্শনিক মতবাদের থেকে আহরণ করা। রক্ত(ারক্তি(র উর্ধ্বেও হিন্দুত্ব এবং ইসলাম, এই দুই ধর্মের আত্তীকরণ এবং সমন্বয়ের প্রচেষ্টা ছিল। এই মিলনের কথা আকবর-এর আগে ভক্তি(বাদী এবং সুফিবাদী দার্শনিকেরা উল্লেখ করেছিলেন।

আকবর-এর সমসাময়িক দুই ইতিহাসবিদদের কাছ থেকে পরস্পরবিরোধী বক্ত(ব্য পাওয়া যায়। Abu Fazl আকবরকে একজন নায়ক, দুর্ধষ সম্রাট, প্রতিভাবান এবং ভগবানের দূত হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করেই আকবরের দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন। অপরদিকে, সভার এক গোঁড়া নেতা, বাদৌনীর মতে আকবরের উদারনীতির জন্যই ইসলাম ধর্ম ধ্বংসলাভ করেছে এবং তিনি আকবরকে একজন খলনায়ক হিসেবে চিহ্নি(ত করেছেন।

আকবরের দর্শনের যথার্থ মূল্যায়ন তার ত্র(মবিকাশের পটভূমিতে ধরা উচিত। আকবর এক সংঘাতপূর্ণ ধর্মীয় আবহাওয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বেড়ে ওঠেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন মধ্যএশিয়ার সুন্নি এবং মাতা ছিলেন এক পার্সী পন্ডিতের সন্তান। হুমায়ুনের পলায়নকালে আকবর এক হিন্দু প্রধানের বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং তাঁর উপর তাদের প্রভাব পড়ে। শৈশবকালে আকবর সুফিবাদের সংস্পর্শেও আসেন। তিনি তাঁর হিন্দু-স্ত্রীদের এবং টোডারমল, বীরবলদের সূত্রে হিন্দু ধর্মের আরো কাছাকাছি আসেন। অস্থিরমতি আকবর ইসলাম ধর্মও হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছিলেন। আকবর সুন্নিবাদের ধর্মতত্ত্ব এবং আইন সম্পর্কে প্রথাগত শি(লাভ করেননি। তাঁর নমনীয় মানসিকতার আর এক প্রধান কারণ শেখ মুবারক এবং আব্দুল লতিফের অধীনে শি(লাভ এবং এক উদার পরিবারে বড় হয়ে ওঠা।

আকবরের ধর্মীয় নীতির মূলে আছে কিছু বৌদ্ধিক প্রভাব। আবুল ফজল-এর মতে রাষ্ট্রীয় নীতির মতাদর্শগত ভিত্তি ছিল রাজার এবং সভার কিছু অভিজাত সদস্যের কোন নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি প(পাত। ইকতিদার আলম খাঁ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন আকবরের দর্শনের প্রধান উপাদান মূলতঃ পার্থিব এবং রাজনৈতিক। আকবরের প্রাথমিক সহনশীলতার নীতি, তীর্থকর ও জিজিয়াকরের লোপ আসলে আনুষঙ্গিক। রাজত্বের শু(র কালে আকবর উদারনীতির ওপর জোর দেন এবং কয়েকটি উদারপন্থা অবলম্বন করেন। তিনি মুকাদ্দম-উল-মুল্ক এর মত কয়েকজন সুন্নি নেতার উপর নজর দেন ও কিছু নেতাকে সভা থেকে বহিস্কারও করেন। জিজিয়া ছিল আসলে রাজপুতদের সাথে

আপোষ এবং এক অর্থনৈতিক কৌশল মাত্র। তিনিই অবার রাজপুতদের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের চেষ্টায় জিহাদ ঘোষণাও করেছিলেন। দেশীয় রাজা এবং অভিজাত ও উলেমা সমন্বিত মুসলিম শাসকশ্রেণীর সাথে আকবরের সম্পর্কের ওপর খাঁ জোর দেন। রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং ধর্মতত্ত্বের মধ্যে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, সেটাই আকবরের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে উন্নত করে। আকবর আসলে বৈজ্ঞানিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন যথার্থ যুক্তি(বাদী। তাঁর জীবনব্যাপী অনুসন্ধিৎসার ফল ছিল তাঁর বি(্বাস—"সকল ধর্মেই সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিল এবং .....যদি কোনো সত্যজ্ঞান থাকে তা সর্বত্রই খুঁজে পাওয়া যাবে।"

আকবরের দর্শন আদর্শবাদ এবং বস্তুবাদের দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়। তাঁর ভাবনা এবং কাজের মধ্যে ফারাক ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ৬০-এর দশকে শেখ আব্দুল নবি এবং মৌলানা আব্দুল সুলতান ঘৌরী প্রভৃতি উলেমাদের নেতৃত্বে গোঁড়া ইসলামের কর্তৃত্ব ছিল। যদিও আকবর তাদের বিরোধিতা করেননি কিন্তু তারা যে রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে হস্ত(প করছিল—এ ব্যাপারেও তিনি সজাগ ছিলেন। তিনি তাদের হাত থেকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কৌশলে হস্তান্তর করার চেষ্টাও করছিলেন। সেজন্য ইবাদাতখানার মতামতও নিয়েছিলেন। এরই ফলস্বরূপ ১৫৭৫ সালে ফতেপুর সিত্রি(তে ইবাদাতখানা-র ভিত্তি স্থাপন হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেখানে ধর্মীয় আলোচনা বসত। প্রথমে এতে অংশগ্রহণ করতে পারত মুসলিমরা এবং তাদের মধ্যে চারটি শ্রেণী ছিল।

(১) শেখ—যারা সাত্ত্বিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার জন্য প্রসিদ্ধ।

(২) সঈদ বা পয়গম্বরের বংশধর।

(৩) উলেমা—ধর্মতত্ত্ববাদী এবং বিচারক।

(৪) সভার অভিজাত সদস্যরা যারা ধর্মতত্ত্বে আগ্রহী।

এই ইবাদাতখানায়, উলেমা এবং ধর্মীয় নেতারা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা করতেন। শীঘ্রই উলেমারা সভার উদার পন্থীদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। আকবর এর সুযোগ নিয়ে প্রমাণ করেন যে ধর্মীয় অভিজাতরা সমাজে কোনো গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে না। তাঁর মানসিক সংকট প্রকট হয়ে ওঠে এবং সুন্নিদের হিংস্র সসহিষু(তার দ(ন গোঁড়া ইসলামদের প্রতি তার বি(্বাস (য়ে যেতে থাকে। শিয়া ও সুন্নিদের অন্তর্বিরোধ ইবাদাতখানায় বির্তকের সৃষ্টি করে। আকবর উপলব্ধি করেন যে ধর্মীয় আলোচনা বৃহত্তর ভিত্তি ছাড়া সম্ভব নয় এবং তিনি ইবাদাতখানাকে 'ধর্মীয় সংসদ'-এ পরিণত করেন। তিনি সমস্ত যুক্তি(কে আন্তরিকতার সাথে শোনেন। বাদৌনীর মতে—"আকবর বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক রীতি ও সাম্প্রদায়িক বি(্বাসগুলো খতিয়ে দেখেন এবং এক অনুসন্ধিৎসুক মন নিয়ে সমস্ত পুঁথিগত তত্ত্ব নির্বাচন ও সংগ্রহ করেন।

১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উলেমারা আকবরকে 'সুলতান-ই-আদিল' মেনে নিয়ে এক বিবৃতিতে মেজহার স্বা(র করেন—যা কিনা আকবরকে 'মুতাহিদ' বা আইনের প্রবর্তকদের থেকেও উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। যত(ণ না পবিত্র কোরানের তত্ত্ব ভঙ্গ হচ্ছে, তত(ণ তিনি কোনো ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করতেন না। পণ্ডিত এবং ধর্মপ্রচারকরা ব্রাহ্মণত্ব, বৌদ্ধধর্ম, সুন্নিবাদ, জৈনধর্ম, ভগবত, জেসমিট ভ্রাতৃদ্বয়, চৈতন্যদেব নিয়ে আলোচনা করতেন। আকবর বিভিন্ন ধর্মের ঐক্য ও ধর্মীয় ঈ(্বরের শ্রেষ্ঠতা প্রসঙ্গে খোলাখুলি প্র(করতেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি 'খলিফা' শাসন চালু করতে চেয়েছিলেন এবং নিজেকে এক ঐ(্বরিক সম্রাট প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি উদারনীতিতে বি(্বাস করলেও নিজেকে ঈ(্বর প্রতিপন্ন করবার লোভ সামলাতে পারেননি। তিনি সমস্ত ধর্মের নেতা হতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য ধর্মলম্বীরা মেনে নিলেও সুন্নি মুসলিমরা তাঁর বহুবিবাহের কারণে তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। যখন তিনি উপলব্ধি করেন যে ভারতবর্ষকে দিব্যতান্ত্রিক বা পুরোহিততান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা যাবে না, তখন তিনি ইবাদাতখানা ভেঙ্গে দেন। পরবর্ত্তী সময়ে একটি ছোট গোষ্ঠীর মধ্যেই সমস্ত আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন। আকবর কোনো নাম না দিলেও জাহাঙ্গীরের দলিলে এই দর্শনে বি(্বাসী লোকেদের 'দিন-ই-ইলাহী' নামে অভিহিত করা হয়।

আকবর প্রজাদের কাছাকাছি পৌঁছবার প্রয়োজনে কয়েকটি ধর্মীয় রীতি, যথা ঝারোখা দর্শন (রাজপুত ঐতিহ্য) প্রচলন করেন এবং হোলি, দিওয়ালি, রাখী প্রভৃতি হিন্দু উৎসবও পালন করেন।

ইসলাম চান্দ্র ক্যালেন্ডার অনুসরণ করলেও তিনি সৌর ক্যালেন্ডার অনুসরণ করেন। এই রীতি প্রচলনের সাথে তিনি তাঁর কিছু অনুচর তৈরী করেন যারা আফগান বা অন্যান্যদের ছেড়ে তাঁকে শাসক হিসেবে মেনে নেন। ইসলামের সংকীর্ণ ঐতিহ্যের উর্ধ্বে উঠে তিনি নিজেকে শক্তি(শালী করেন এবং ১৫৭৯ সালে "মেজহার নামা" বা অভ্রান্ততার ঘোষণাপত্র (Infallibility decree) অনুমোদন করেন। একই সালে তিনি নিজেকে ইসলামধর্মীয় আইনের একমাত্র মধ্যস্থতাকারী এবং ধর্মনিরপে(নেতা হিসেবে ঘোষণা করেন। সুন্নিরা এই বিধান অমান্য করে এবং এর পরবর্ত্তী সময়ে মৃত্যুকাল (১৬০৫) অবধি তিনি সুন্নি র(ণশীলতাকে কোনোরকম গু(ত্ব দেননি।

মেজহার প্রবর্ত্তনের কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বি(দ্ধে কাফের ফতোয়া জারি করা হয় এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরে আকবর সমস্ত ধর্মীয় বিতর্ককে দূরে সরিয়ে দেন। তিনি ইসলাম ঘেঁষা নীতি থেকে নিজেকে মুক্ত(করেন এবং এক নতুন ধর্মীয় নীতি 'সুল-ই-কুল' প্রচলন করেন। 'সুল' অর্থাৎ পথ এবং 'কুল' অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব—এই বি(্বভ্রাতৃত্ব পরবর্তীকালে 'দিন-ই-ইলালী' নামে পরিচিত হয়। এই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে মুঘল সাম্রাজ্যের এক নতুন দর্শন 'দিন-ই-ইলাহী' জন্ম নেয়। রিজভি এবং রিচার্ডসের মতে — 'দিন' হচ্ছে শাসক এবং প্রজাদের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক বন্ধন, যাতে প্রজারা তাঁকে আধ্যাত্মিক গু(হিসেবে মেনে নেয়। সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের চিহ্(হিসেবে প্রজারা নিজস্ব ধর্ম, সম্পত্তি, সম্মান এবং জীবন তাঁর প্রতি অর্পণ করেছিল। এসত্ত্বেও আকবর কোনোদিনও 'দিন-ই-ইলাহী'-কে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেননি। তিনি অতি সহজেই তাঁর (মতার জোরে প্রজাদের ধর্মান্তরিত করতে পারতেন, কিন্তু সচেতন ভাবেই এই কাজ তিনি থেকে বিরত থাকেন। শুধুমাত্র বীরবল স্বেচ্ছায় 'দিন-ই-ইলাহী' গ্রহণ করেন। সুতরাং 'দিন-ই-ইলাহী' 'সুল-ই-কুলের' এক রাষ্ট্রীয় ভাষ্য হয়ে থাকে, যার মধ্যে দিয়ে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের অভ্যাস করেন। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে আকবরের ধর্মীয় শি(াকে কোনো নতুন বি(্বাস হিসেবে দেখেননি। এটা বিভিন্ন ধর্মের ঐক্যের ওপর জোর দেয় এবং পশ্চিমের ধর্মনিরপে(তার এক বিকল্প। এটা দেখায় যে ধর্মনিরপে(তা বা জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র ইউরোপেই সীমাবদ্ধ নেই, ওই প্রাচ্যেও বর্ত্তমান।

যদিও রাষ্ট্র সব ধর্মকেই স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু সুল-ই-কুলের সঙ্গে প্রত্যেককেই সমমর্যাদা দেওয়া হয়। 'সুল-ই-কুল'-এর দর্শন হল মিলাট যা শিষ্যদের নিজেদের সময়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন না রাখার শি(া দেয় এবং তারা যেন অন্য যে-কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরোধিতায় বিচলিত না হয়। তিনি প্রজাদের 'সুল-ই-কুল'-এর পথ অনুসরণ করতে বলেন যা কিনা চরম শান্তির একমাত্র পথ।

আকবর বিভিন্ন হিন্দু, জৈন, জোরাষ্ট্রিয়ান, খৃষ্টীয় মতের দ্বারা আকৃষ্ট হন। সুফিবাদের কিছু অতীন্দ্রিয় ধারণাও তাকেও আকৃষ্ট করে। কিন্তু কোনো মতই তার আধ্যাত্মিক আকাঙ(ার অবসান ঘটাতে পারে না এবং ঐক্য ও শান্তি নিশ্চিত করতে পারে না। তিনি এক নতুন ধর্মের বিকাশ করতে চান যা কিনা 'সমস্ত ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধারণাগুলো নিয়ে এবং ত্রুটিগুলো বাদ দিয়ে' তৈরী হবে। এই দৃষ্টি নিয়ে তিনি বিভিন্ন ধর্মের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি(, অভিজাত পদাধিকারীদের নিয়ে এক সভার ডাক দেন। 'দিন-ই-ইলাহী' যা 'জৌহাদ-ই-ইলাহী' হিসেবে স্বীকৃত ছিল—তার কোনো বর্ণনা না দিলেও এটি ঈ(্বরের বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল না। এর কোনো বিশিষ্ট তত্ত্ব বা দর্শন ছিল না। শুধুমাত্র এক পরম ঈ(্বরে বি(্বাস ছিল। দিন-ই-ইলাহীর এক আচরণ বিধি ছিল যা উদারতা, পরোপকারতা, (মা, কোমলতা, জাগতিক লিপ্সা থেকে সংযম, পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তি(প্রভৃতি গুণাবলীর অভ্যাস করত।

ফতেপুর সিক্রি(তে ইবাদাতখানার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আকবরের কাজকর্ম বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

স্ট্রেমঞ্চের মতে আকবর ইসলামের আইন না ভেঙে উলেমাদের কর্তৃত্ব শেষ করবার পন্থা খুঁজছিলেন। রিজভির মতে "অভ্রান্ততার ঘোষণাপত্র" ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করেনি কিন্তু মুঘল সভায় ইসলামের আইনের ব্যাখ্যা করার

(মতা সম্রাটকে প্রদান করেছিল। এখান থেকেই দুটি বিতর্কিত প্র(ওঠে—আদৌ ইসলামের প্রতি আকবরের মনোভাব পরিবর্ত্তন ঘটেছে কিনা এবং তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের জন্য বিকল্প ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন কিনা।

বাদৌনী ইসলামের ধ্বংসের জন্য আকবরের সমালোচনা করেন। অপরদিকে "জেসুইট ভ্রাতা"রা দাবী করে যে আকবর ১৫৭৯ থেকে ১৬০৫-এর মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের কাছাকাছি আসেন। যদিও ঐতিহাসিক গবেষণনা প্রমাণ করে যে আকবর কোনোদিনও নিজেকে অবি(াসী ঘোষণা করেননি, এবং একজন নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলিম হিসেবেই দেহত্যাগ করেন। এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে তিনি উলেমাদের সভা থেকে বিতাড়িত করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে সুন্নি রীতিনীতি পালন করা হয়। আকবর দিন-ই-ইলাহীকে কোনোদিনও ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেননি। তিনি ইসলাম শি(ার পৃষ্ঠপোষকতাও করেন এবং সমস্ত ধর্মগোষ্ঠীকে একইরকম বদান্যতা দেখান।

আবু ফজল-এর 'আকবরনামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' পড়লে দেখা যায় যে ঈ(রের প্রতি তাঁর অটল বি(াস থাকলেও তাঁর ঈ(রপূজার পদ্ধতি প্রচলিত ইসলাম বা হিন্দু পদ্ধতিগুলোর থেকে ভিন্ন ছিল। তিনি হিন্দুদের মূর্ত্তি পূজা ও ইসলামদের প্রার্থনা-রীতি দুটোকেই নিন্দা করেন। প্রচলিত সুফি মতবাদে ঈ(রকে নিরাকার বলা হয় এবং মানুষের বৃহত্তর প্রয়াস ছাড়া তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না। আকবরের বি(াস এর সাথে অনেকটাই মিলে যায়। তাঁর মতে ঈ(রপূজার প্রকৃত পন্থা হবে "আলোকিত যা আলো ভালোবাসে"। একজন সম্রাট হিসাবে তিনি হলেন 'ভগবানের নির্বাচন'—আকবর নিজেকে ঈ(রের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত(হিসাবে দেখেন, যা কোন বিশেষ ধর্মের উপর নির্ভর করে না। তিনি সর্বে(রবাদ (Pantheism)-এর কথা বলেন যা কোনো জীবন্ত প্রাণীকে হত্যা বা যুদ্ধ ছাড়া কোনো অস্ত্র বহন করা নিষেধ। সর্বে(রবাদের দ্বারা তিনি হিন্দু এবং ইসলাম উভয় মতবাদের বিকৃত চিন্তাগুলির খোলাখুলি নিন্দা করেন। যদিও সর্বে(রবাদের তত্ত্ব কয়েকটি বিশিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু 'সুল-ই-কুল'-এর তত্ত্ব তাঁর সাম্রাজ্যনীতির সমস্ত বৃত্তেই ছড়িয়ে পড়ে। তিনি প্রকৃতপ(মুঘলশাসকদের বিভিন্ন মতবাদ দিয়ে গঠিত এক বিমিশ্র চরিত্র সৃষ্টি করেন। তিনি সুন্নি-শিয়াদের বিরোধিতারও অবসান ঘটান। তাঁর দার্শনিক প্রবণতা ধর্মীয় জটিলতাগুলোকেও বোঝবার সাহায্য করে। তিনি মুসলিমদের 'গো-হত্যা' এবং হিন্দুদের 'সতীদাহ' প্রভৃতি রীতিগুলোও রদ করেন।

অধ্যাপক শর্মা মুঘল সাম্রাজ্যের ধর্মীয় নীতির আলোচনায় বলেন যে আকবর কোনো নতুন ধর্ম চালু করেননি, এমনকি 'দিন-ই-ইলাহী' নামকরনও করেননি। উপসংহারে বলেন যে আকবর তাঁর তীক্ষ্ম বন্দিকে আশ্রয় করে সাম্রাজ্যবৃদ্ধির প্রয়াসে এক নতুন পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মীয় মতবাদের প্রচলন করেন, যা তিনি বিভিন্ন সূত্র থেকে আহরণ করেন এবং যুক্তি(র ব্যাপক প্রয়োগে যা ত্র(মশঃ তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে। 'সুল-ই-কুল' এর সমালোচকরা একে পরিত্যাগ করলেও এটা স্মরণীয় যে আকবর ভারতবর্ষের বহুমাত্রিক সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে এক সংহতিপূর্ণ শাসনব্যবস্থা স্থাপনের প্রয়াসে ছিলেন। তাঁর দর্শন একটিমাত্র স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল ছিল না, কারণ তাঁকে সামরিক রাষ্ট্রের দ্রুত বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হত।

তাঁর কাছে দর্শনের থেকে রাজনীতি চিরকালই বেশী গু(ত্বপূর্ণ ছিল। ফলতঃ তিনি যখন সিংহাসনে অধিষ্ঠান করেন তখন তিনি সেলিম চিস্তির দরগায় তাঁর আনুগত্য দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে আবার ধর্মের নামের যুদ্ধ ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেননি। তবুও আকবর ছিলেন প্রকৃতপ(এক উদারমনস্ক মানুষ। যদি তাঁর দর্শন ভারতবর্ষের আধুনিক রাষ্ট্র গঠনকারীদের প্রভাবিত করে থাকতে পারে, তাহলে তা হবে মধ্যযুগীয় ভারতীয় ইতিহাসের এই দুর্ধর্ষ মানুষটির দূরদৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

৩.৩ জাহাঙ্গীর

মুঘল রাজবংশে সেলিম হলেন প্রথম যুবরাজ যিনি কোন কলহ বা সংগ্রাম ছাড়াই নুরউদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর

পাদশা গাজী উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। বাদশা তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন যে, জাহাঙ্গীর (পৃথিবীর ধারক) নাম গ্রহণের কারণ রাজার কর্তব্য হচ্ছে পৃথিবীকে আয়ত্বে রাখা এবং নুরউদ্দিনের অর্থ তিনি সূর্যোদয়ের অনতিপরে সিংহাসনে বসেন। এছাড়াও এর আর একটি কারণ হল বিজ্ঞ ব্যক্তি(রা এই উপাধি পূর্বেই নির্ধারণ করে দিয়েছিল। তিনি বিলাসের মধ্যে লালিত পালিত হন। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এবং তাঁর পিতামাতার প্রথম জীবিত সন্তান হিসাবে তাঁর উপর অত্যধিক স্নেহভালবাসা ও যত্ন বর্ষিত হয়। আবদুর রহিম খাঁ নামক একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি(র নিকট তিনি সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যা লাভ করেন। সঠিক প্রশাসনিক ও সামরিক শি(াও তিনি লাভ করেন। বারো বছর বয়সে তিনি কাবুল অভিযানের নেতৃত্ব দেন এবং ষোল বছর বয়সে ১২০০০ সৈন্যের অধিনায়ক পদে উন্নিত হন। তাঁর জীবনের ষোলটি বসন্ত অতিত্র(ান্ত হবার পূর্বেই অম্বরের রাজা ভগবান দাসের কন্যা মন রাজের সাথে ১৫৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে খুবই জাঁকজমকের মধ্যে তাঁর বিয়ে হয়। এক বছর পর তিনি জগৎ গোঁসাইকে বিবাহ করেন যিনি পরে শাজাহানের জন্ম দেন। ফাদার জেভিয়ারের মতে ১৫৯৮ সালে তাঁর হারেমে কুড়ি জনের কম আইন সিদ্ধ স্ত্রী ছিল না। ডাঃ বেণী প্রসাদ বলেন র(তা নিয়ে তাঁর হারেমের অধিবাসীর সংখ্যা দাড়ায় ৩০০। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আকবরের মৃত্যুর পর ৩৮ বছর বয়সে ১৬০৫ সালে সিংহাসনে বসার পূর্বে সেলিম আরাম, ফুর্তি এবং লাম্পট্যের মধ্যে জীবন কাটান। তিনি ভাগ্যবান ছিলেন কারণ পিতা আকবর তাঁর জন্য এক বিশাল সাম্রাজ্য এবং ভাল প্রশাসন রেখে যান। জাহাঙ্গীরকে তাই সাম্রাজ্যকে শক্তি(শালী করার জন্য প্রায় কিছুই করতে হয়নি। তাঁর শাসনকালে তিনি দুই দশক ধরে (১৬০৫-২৭) কোন বড় বিদ্রোহের সম্মুখীন হননি। হলে হয়ত তার প(তা দমন করা কঠিন হত। তিনি তাঁর পিতার নীতিগুলি অনুসরণ করেছিলেন, ফলে কোন সমস্যা ছাড়াই পরিপূর্ণভাবে আনন্দফুর্তি উপভোগ করতে পেরেছিলেন। তাই এটা আশ্চর্যের নয় যে জাহাঙ্গীরের মধ্যে একটি দয়ালু এবং স্নেহশীল স্বভাব ও অসংযমী অভ্যাস গড়ে উঠেছিল।

জাহাঙ্গীরের শাসনকাল আনন্দফুর্তি এবং উৎসবের মধ্যে শু(হয়েছিল। বন্দীদের মুক্তি(দেওয়া এবং শত্রু মিত্র প্রভেদ না করে উপাধি বর্ষণ করা হয়েছিল। ১৬০৬ সালের নওরজ (নববর্ষ) তিনি দুই সপ্তাহ ধরে বিশাল জাঁকজমক ও পানভোজনের মধ্য দিয়ে পালন করেন। মহান বাদশাদের ঐতিহ্য মেনে তিনি তাঁর নতুন রাষ্ট্রীয় নীতির বারোটি নির্দেশ জারী করেন। এগুলি হল— (১) খাজনা মকুব (২) জাতীয় সড়কে চুরি ডাকাতি বন্ধ করতে নির্দেশ (৩) মৃত ব্যক্তি(র সম্পত্তিতে অবাধ উত্তরাধিকার (৪) মদ এবং সমস্ত রকম নেশার সুরার উপর নিষেধাজ্ঞা (৫) অপরাধীদের নাক, কান কাটা বা বাড়ীর দখলের উপর নিষেধাজ্ঞা (৬) বলপূর্বক সম্পত্তি দখলের উপর নিষেধাজ্ঞা (৭) কোন কোন ঐতিহাসিক স্থান বা রাজে পশুবলির উপর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। কিন্তু এসব জাহাঙ্গীরের মনের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তিনি বৃদ্ধ বয়সে নুর জাহানের হাতের ত্রীড়ানক ছিলেন।

এটি সৌভাগ্যের কথা যে জাহাঙ্গীর তাঁর শাসন কালের কথা তাঁর স্মৃতিকথা "তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরে" পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন। প্রিঙ্গল কেনেডি বলেন "যদিও সঠিক ইতিহাসের জন্য এই স্মৃতিকথা নির্ভরযাগ্য নয় কারণ ঘটনার অতিরঞ্জন করা এবং চাটুকারী প্রবণতা হচ্ছে প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য, তথাপি তৎকালিন ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে জাহাঙ্গীর নিজেকে কিরূপে দেখাতে চান এবং সত্যি সত্যি কি ছিলেন তা খুবই মুল্যবান। সার রির্চাড বার্ন বলেন "যদিও স্মৃতিকথাগুলি মানুষের উচ্চাকাঙ্খা, ভয় ও আশার সঠিক দলিল নয় এবং চলমান ঘটনাবলীর যথার্থ মুল্যায়নের ে(ত্রে নির্ভরযোগ্য নয় তথাপি লেখকের চরিত্র বুঝতে এগুলি খুবই সহায়ক।" ইংল্যান্ডের রাজা জেমস জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরাজদের জন্য ব্যবসার সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে ক্যাপটেন উইলিয়াম হকিন্স এবং সার টমাস রোকে রাজদূত করে পাঠান। হকিন্স ১৬০৮ সালে ভারতে আসেন এবং তিন বছর থাকেন। প্রাথমিক ভাবে পর্তুগীজদের বিরোধিতার জন্য সম্রাটের সা(াৎ পেতে তার খুব অসুবিধা হয়। কিন্তু যখন তিনি সা(াৎ করতে স(ম হন তখন তাঁকে খুব সুন্দর ভাবে স্বাগত জানান হয়। তিনি শীঘ্রই সম্রাটের সখ্যতা লাভে সমর্থ হন। কিন্তু পর্তুগীজদের ষড়যন্ত্রের জন্য তার

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সফল হয়নি। সার টমাস রো ১৬১৬ সালে জাহাঙ্গীরের দরবারে পৌছন এবং তিন বছর থাকেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয় কারণ তিনি ইংরাজদের সুরাটে ব্যবসা করার ফরমান আদায় করেন। হকিন্স এবং রো দুইজনেই তাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে বিস্তৃতভাবে মুঘল দরবারের অবস্থা এবং বাদশার কর্মধারা সম্বন্ধে লেখেন। এ দু'জন ছাড়াও টেরী, পিত্রো-ডেলা-ভালে এবং পেলর্সাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে তাঁদের ভারতের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। এ সমস্ত বৃত্তান্তগুলি বাদশার চরিত্র এবং ব্যক্তি(ত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা গড়তে সাহায্য করে। এটা মনে রাখতে হবে যে সম্রাট তাঁর স্মৃতিকথায় তাঁর সফলতা এবং গুণাবলীর হয়ত অতিরঞ্জন করেছেন কিন্তু বিদেশী ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত মূলত তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং তা ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে নৈর্ব্যক্তি(ক নয়। জাহাঙ্গীরের চরিত্র এবং ব্যক্তি(ত্বকে সঠিক বোঝার জন্য আমাদের দুই ধরনের উপাদানের মধ্যে একটা ভারসাম্য আনতে হবে।

হকিন্স বলেন, "সম্রাট খুবই সদয় এবং হাসিহাসি মুখে আমাদের সহৃদয় স্বাগত জানান" এবং একজন পর্তুগীজ পাদরির সাহায্যে রাজা জেমসের পাঠানো চিঠি পড়ে বলেন, "রাজা যা লিখেছেন তিনি তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে তার চেয়ে বেশী প্রদান করবেন।" তিনি আরও বলেন যে সম্রাট তাঁকে তাঁর ব্যক্তি(গত ঘরে নিয়ে যান এবং অনেক(ণ ধরে দীর্ঘ কথোপকথন করেন। সম্রাট তাঁকে প্রতিদিন আসতে বলেন। "দিনে এবং রাতে, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশের বিষয় নিয়ে আমার সাথে কথা বলায় তিনি আনন্দ পেতেন।"

হকিন্স জাহাঙ্গীরের একটি চমৎকার ছবি এঁকেছেন। "এখন এখানে আমি তাঁর দরবারের আদব কায়দা এবং রীতি নিয়ে কিছু বলতে চাই। দিন শু(র সময় প্রথমে সকালে বিছানায় তিনি পশ্চিমে মুখ করে মালা জপ করতেন। যখন তিনি আগ্রায় থাকতেন তখন তাঁর প্রার্থনা করার কায়দা ছিল এইরকম। একটি সুন্দর পরিষ্কার ঘরে সুস্থাপিত একটি পাথরে শুধুমাত্র একটি পারসিক ভেড়ার চামড়ার উপর বসে তিনি জপ করতেন। এই পাথরের উপরিভাগে মাতা ও খৃষ্টের খোদিত ছবি ছিল। সেখানে বসে ৩২০০ বার পুথি গুণে মন্ত্র জপ করে তাঁর প্রার্থনা শেষ করতেন। এটি করার পর তিনি প্রজাদের দর্শন দিতেন এবং তাদের সেলাম গ্রহণ করতেন। প্রতিদিন সকালে বহুলোক এই উদ্দেশ্যে আসতন। এরপর তিনি দু'ঘণ্টা আবার ঘুমাতেন এবং পরে আহার গ্রহণ করে তাঁর মহিলাদের সাথে সময় কাটাতেন। দুপুরে আবার তিনি দর্শন দিতেন। বেলা তিনটে পর্যন্ত নানা রকম মানুষের খেলাধুলা, পশুদের লড়াই এবং অন্যান্য খেলা দেখে সময় কাটাতেন। তিনটের সময় সাধারণভাবে সুস্থ থাকলে আগ্রার সব অভিজাতরা দরবারে হাজির হত। সম্রাট তাঁর রাজকীয় সিংহাসনে বসে দর্শন দিতেন। প্রত্যেকটি লোক তাঁর পদমর্যাদা অনুসারে সম্রাটের সামনে দাঁড়াত। প্রধান প্রধান উচ্চপদস্থ ব্যক্তি(রা লাল সীমানা ঘেরা জায়গায় দাঁড়াত। অন্যরা এর বাইরে থাকত। সম্রাট প্রতিদিন দুঘন্টা ধরে এখানে অভাব অভিযোগ শুনতেন। এরপর প্রার্থনার জন্য তিনি তাঁর ব্যক্তি(গত জায়গায় চলে যেতেন। প্রার্থনার পর ভাল করে সাজিয়ে চার পাঁচ রকমের ঝলসানো খাবার আনা হত। তা থেকে তিনি তার পছন্দমত কিছু খাবার কড়া পানীয়ের সহযোগে খেতেন। এরপর দুঘন্টা ঘুমানোর পর তাঁকে জাগিয়ে নৈশ্যভোজন তার কাছে আনা হত। তখন তিনি খেতে চাইতেন না, কিন্তু জোর করে মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। এটা চলত রাত একটা পর্যন্ত। বাদবাকী রাত তিনি ঘুমিয়ে কাটাতেন।" স্যার রো রাজদরবারের একটি বর্ণনা দিয়েছেন। একদিন গভীর রাতে রো শুয়ে পড়ার পর সম্রাট একটা ছবি দেখানোর জন্য ডেকে পাঠান। রো এইভাবে বর্ণনা দিয়েছেন ঃ—

যখন আমি এসেছিলাম তখন তিনি একটি ছোট সিংহাসনে আড়াআড়ি ভাবে পা রেখে বসেছিলেন। সিংহাসনটি হীরা, মুক্ত(া ও চুনীতে ভূষিত ছিল। সামনে একটি সোনার টেবিল, তাতে মণিরত্ন খচিত পঞ্চাশটি সোনার থালা ছিল। অভিজাতরা মহার্ঘ-ভূষণে আচ্ছাদিত হয়ে হাজির ছিল। তাদের রাজা আনন্দফুর্তির জন্য পান করতে বলেন। বিশাল বিশাল মদিরার ঘড়া সাজান ছিল। নিজে পান করে এবং অন্যদের পান করতে বলে সম্রাট ও তাঁর সব পাত্রমিত্ররা অচিরেই আমার দেখা হাজার মজার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল।

পেত্রো ডেলা ভালে ১৬২৩ সালে ভারতে এসেছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী নুরজাহান সম্বন্ধে

লেখেন যে ঃ "তাঁর সমস্ত নারীদের মধ্যে একজন স্ত্রী বা মহিষীকে তিনি সবচেয়ে বেশী গণ্য করতেন এবং প্রশ্রয় দিতেন। আজ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য এই মহিষীর পরামর্শে চালিত হত। মহিষীকে নুরমহল বলে ডাকা হত। নুরমহলের অর্থ হল প্রাসাদের আলো।"

বিদেশীদের এইসব বর্ণনা আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করে যে নবাব জাঁকজমকের মধ্যে বাস করতেন এবং তাঁর পারিষদরা অবি(াস্য ধনী ছিল। তিনি তাঁর প্রজাদের ভালবাসতেন এবং তাদের কল্যাণের উপর নজর রাখতেন। তিনি প্রচুর পান করতেন এবং জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আরাম এবং আমোদে থাকা। ধর্মীয় বিষয়ে তিনি ইসলামে অনুরক্ত(থাকলেও, অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল ছিলেন। তিনি তাঁর মহিষীকে আবেগ দিয়ে ভালবাসতেন। প্রশাসনের বিষয়ে মহিষীর (নুরজাহান) মতামত চূড়ান্ত ছিল।

জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিকথায় স্বীকার করেন যে তিনি অতিরিক্ত(পাণাসক্ত(ছিলেন। তিনি লেখেন "প্রথম দিকে আমি যখন আকুলভাবে পান করতে চাইতাম তখন দুই বার পরিশোধিত করা প্রায় কুড়ি পেয়ালা পান করতাম। পরবর্তীকালে এর কুফল বুঝতে পেরে আমি পরিমাণ কমানোর চেষ্টা করি। সাত বছরের মধ্যে আমি এটা ৫ বা ৬ কাপে নামিয়ে আনি। আমার পানের ভিন্ন ভিন্ন সময় ছিল। কখনও দিবাবসানের ২-৩ ঘন্টা আগে, কখনও রাত্রে পান করতাম। কিন্তু দিনের বেলা খুবই কমই পান করতাম। সুতরাং আমার ত্রয়োদশ বর্ষে আমি স্থির করেছিলাম যে আমি রাত্রে ছাড়া পান করব না। বর্তমানে আমি কেবলমাত্র হজম শক্তি(বাড়ানোর জন্য পান করি।"

জাহাঙ্গীর শুধুই পানাসক্ত(ছিলেন না। তিনি সু-শাসক এবং শিল্পের এক মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আবুল হাসান নামক একজন চিত্রকর-যাকে নাদির-উজ-জামান উপাধি দেওয়া হয়—সম্রাটের দরবারের একটি ছবি আঁকেন এবং বাদশাকে উপহার দেন। "জাহাঙ্গীরনামা"র সামনের পাতায় এই চিত্রটিকে ব্যবহার করা হয়। এটি খুব উচ্চস্তরের হওয়ায় বাদশা তাঁকে প্রচুর উপহার দেন। বাদশা চিত্রকলা খুব পছন্দ করতেন এবং সেগুলির এমন বিচার করতে পারতেন যে কোনটি কোন জীবিত বা কোনটি কোন মৃত চিত্রকরের সৃষ্টি তা বলতে পারতেন। যদিও জাহাঙ্গীর নিজে গোড়া সুন্নী মুসলান ছিলেন এবং প্রত্যহ প্রার্থনা করতেন তবুও ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি সহনশীল ছিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর কোনও বিদ্বেষ ছিল না এবং তাঁর মহান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনেক হিন্দু রীতি ও উৎসব মানতেন। কিন্তু তিনি মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন এবং কাংড়া বিজয়ের পর পবিত্র মন্দির প্রাঙ্গনে গ(বলি দেন। খৃষ্টানদের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা ছিল। তাদেরকে ধর্মপ্রচারে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল।

এটা খুবই দুঃখের যে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা খৃষ্টান মিশনারিদের বর্ণনাকে আধার করে নবাবের চরিত্র এবং ব্যক্তি(ত্বের ছবি আঁকেন। এগুলি মহান আকবরের মহান পুত্রের প্রতি প(পাতদুষ্ট এবং অন্যায্য। ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁর চরিত্রচিত্রনে বলেন—"কোমলতা ও নিষ্ঠুরতার, সুবিচার ও খামখেয়ালিপনার পরিশীলতা ও পশুত্বের সৎবুদ্ধি আবার ও ছেলেমানুষির এক অদ্ভুত মিশ্রণ।"

লেনেপুল বলেন "১৬০৫ সালে যখন তিনি ৩৭ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন তাঁর চরিত্রে ভাল গুণের অভাব ছিল না। এখন তিনি অনেক কোমল এবং তাঁর নিষ্ঠুরতা কমে গিয়ে অনেক বেশী সংযত। দিনের বেলায় তিনি ছিলেন মিতাচারী এবং রাতে খুবই মহিমাময়।" বিভারেজ মন্তব্য করেন যে, "জাহাঙ্গীর সত্যই একজন অদ্ভুত মিশ্র চরিত্রের মানুষ ছিলেন। একজন জীবন্ত মানুষের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া দাঁড়িয়ে দেখতে পারার সাথে সাথে সুবিচারে অনুরক্ত(ছিলেন। বৃহস্পতিবারের প্রতিটি সন্ধ্যায় উচ্চমার্গের কথাবার্তা বলে অতিবাহিত করার পাশাপাশি আবুল ফজলকে হত্যার প্ররোচনা দেওয়া এবং বিনা অনুশোচনায় তা স্বীকার করাও তাঁর চরিত্রের অঙ্গ ছিল। আবার শীতকালে সম্রাটের হাতিরা জলত্রীড়ার পর শীতে কাতর হলে তিনিও সমব্যথি হয়ে উঠতেন।

জাহাঙ্গীরের একনিষ্ঠ সমর্থকদের মধ্যে আমরা ঈ(রীপ্রসাদ ত্রিপাঠী ও বেণীপ্রসাদের মতামত দিতে পারি। ডাঃ ঈ(রী প্রসাদ লেখেন—মুঘল ইতিহাসে জাহাঙ্গীর একজন চিত্তাকর্ষক ব্যক্তি(ত্ব। তিনি একজন ইন্দ্রিয়পরায়ণ, আমোদপ্রিয়,

নির্মম অত্যাচারী, মানুষ ছিলেন বলে সাধারণত যে ধারণা আছে তা সঠিক নয়। সমস্ত বিবরণ অনুযায়ী তিনি একজন বুদ্ধিমান, বিচ(ণ এবং সহজেই রাজ্যের সমস্ত জটিল সমস্যা বোঝায় সমর্থ ছিলেন।" ডাঃ ত্রিপাঠীর মতে "জাহাঙ্গীর সাহিত্য ও শিল্পকলার সুক্ষ্ম (চিতে সমৃদ্ধ ছিলেন। প্রকৃতি, জীবজগৎ বৃ(রাজির এবং সৌন্দর্যের রসবোধ তার স(ম বর্ণনার সমান ছিল। তাঁর স্মৃতিকথা তাঁর নিজস্বতার সা(্য বহন করে তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা, প্রকৃতিপ্রেম এবং অন্যান্য গুণের সা(্য দেয়। ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল যা নাকি তিনি অসুস্থ অবস্থায়ও পালন করতেন। তার মৃত্যুর বহু বছর পরেও তাকে ন্যায়পরায়ণ রাজা হিসাবে মনে করা হত। জাহাঙ্গীর শিল্প ও সাহিত্যের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর শাসনকালেই চিত্রকলা উন্নতি লাভ করে, স্থাপত্যে নতুন অলঙ্করণ যুক্ত(হয়। সাহিত্যে যদিও তাঁর পিতার আমলের মত না হলেও যথেষ্ট তবু প্রাণবন্ত ছিল। ডাঃ বেণিপ্রসাদ তাঁর সময়ের প্রশংসা করে বলেন ঃ—"তাঁর পিতার কালজয়ী গৌরবগাথা এবং পুত্রের উজ্জ্বল দীপ্তিময় ছবির কাছে তাঁর খ্যাতি অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। তাঁর সমস্ত জীবনের পুর্নবিচার করলে তিনি একজন বিচ(ণ, সহৃদয়, পরিবারের প্রতি গভীর মমতাময় এবং সকলের প্রতি উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি(হিসাবে প্রতিভাত হন। তাঁর অত্যাচারের প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি গভীর আসক্তি(ছিল। সব মিলিয়ে জাহাঙ্গীরের শাসনকাল সাম্রাজ্যের প(শান্তি ও সমৃদ্ধি এনেছিল। তাঁর শাসনে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হয়, স্থাপত্য উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ করে, চিত্রকলা খ্যাতির শীর্ষে পৌছায় এবং সাহিত্য এমন বিকাশ লাভ করে যা পূর্বে কখনও হয়নি। এই সময় তুলসীদাস রামায়ণ রচনা করেন যা তাৎ(ণিকভাবে হোমার, বাইবেল, সেকসপিয়ার এবং মিলটনের মত উত্তর ভারতের ল(ল(লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এই সময় বহু উল্লেখযোগ্য পারসিক এবং দেশীয় ভাষার কবি সমবেত ভাবে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে সাহিত্যের এক স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেছিল। জাহাঙ্গীরের আমলের রাজনৈতিক ইতিহাস যথেষ্ট আকর্ষণীয় হলেও সাংস্কৃতিক ((ত্রে উন্নতিই এই সময়কার প্রধান গুণ।

রিচার্ড র্বাণ-এর উক্তি(দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে। তিনি বলেন "ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে তিনি ছিলেন এক উদারমনা মানুষ, যিনি খেলা, শিল্প ও সুন্দর জীবন যাপনের প্রেমিক ছিলেন। তিনি সবার ভাল করার চেষ্টা করতেন, কিন্তু শুধুমাত্র সুক্ষ্ম বুদ্ধির অভাবের জন্য মহান প্রশাসকের স্তরে পৌঁছাতে পারেন নি।"

৩.৪ শা-জাহান

বাদশা শা-জাহানের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য তার গৌরবের শীর্ষে পৌঁছায়। সাধারণভাবে এই সময়কে মুঘল রাজত্বের স্বর্ণযুগ বলা হয়। স্ট্যানলি ইয়ানপোল এবং ঈশ্বরী প্রসাদ শা-জাহানকে এক মহৎ বাদশা বলে অভিহিত করেন। এলফিসটোনের মতে শা-জাহানের যুগ তৎকালীন সময় পর্যন্ত সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী যুগ। অবশ্যই তাঁর সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য তার গৌরব এবং উজ্জ্বলতার শীর্ষে পৌঁছায়। তখন দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। ভারতের অবিশ্বাস্য ধনদৌলতের খ্যাতি বহু দূর দেশের অনেক বিদেশীকে এদেশে টেনে এনেছিল। তারা বাদশা এবং তার চর্তুদিকের জাঁকজমক দেখে হতবাক হয়ে যায়। রাজদরবারে জাঁকজমক তাদের কল্পনার অতিরিক্ত(ছিল এবং তারা অকৃপণভাবে এ সম্বন্ধে লেখেন। তাজমহল, জামা মসজিদ, দিয়ানি আম, দিওয়ানি খাস এবং আরও অনেক শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য যা নাকি শা-জাহান নির্মাণ করিয়েছিলে সেগুলি আজও মুঘল সাম্রাজ্যের মহিমা এবং শাজাহানের শাসনকালের গৌরব বহন করে। কিন্তু এই আড়ম্বর ও বিশালতার ছটার আড়ালে পতন ও অব(য়ের চিহ্(ফুটে উঠেছিল। এই সব বৃহৎ নির্মাণকার্য, যুদ্ধ ইত্যাদির অর্থ যোগানের জন্য রায়তদের এবং অন্যদের উপর করের নিদা(ণ বোঝা চাপান হয়েছিল। রাষ্ট্রের প্রশাসন মাথাভারী এবং বোঝাস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। প্রশাসনিক যন্ত্র ধীরে ধীরে গতিহীন এবং অকার্যকরী হয়ে উঠেছিল। শা-জাহানের রাজত্বকাল আর্থিক দিক থেকে ফ্রান্সের চর্তুদশ লুই-এর সময়ের মত হয়ে ওঠে। বাদশা বয়স

বাড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধ হলে প্রশাসনিক এবং আর্থিক অব(য়ের স্পষ্ট ল(ণগুলি দেখা দিতে থাকে। এডওয়ার্ড এবং গ্যারেটের বলেন শা-জাহানের শাসন মুঘল সাম্রাজ্য ও তার অর্থব্যবস্থার মৃত্যু ঘন্টা ধ্বনিত করে। দিল্লীর শাহজাহানের ইতিহাসের রচয়িতা ডাঃ বি. পি. সাক্সেনাও এই মত সমর্থন করে লেখেন যে সাম্রাজ্য ধ্বংসের অনেকগুলি প্রবণতার উৎস ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শা-জাহানের শাসনকালে খুঁজে পাওয়া যায়। শা-জাহানের শাসনকাল তাই এক বিচিত্র স্ব-বিরোধী চিত্র হাজির করে যা নাকি এ বিষয়ে আমাদের বিচ(ণ ও ভারসাম্য দৃষ্টিভঙ্গী দাবী করে।

শা-জাহান গভীর রাত্রে শয্যাগ্রহণের আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। প্রতিদিন সকালে তিনি তাঁর প্রজাদের 'ঝরোকা দর্শন' দিতেন। এই সময় সাধারণ জনগণ রাজ সান্নিধ্যের অবাধ অধিকার পেত এবং তারা সর্বোচ্চ রাজকর্মচারীদের অবিচারের বি(দ্ধে নবাবের বিচার চাইতে পারত। এটি অবশ্যম্ভাবী যে দরবারের রাজকীয় গম্ভীরতা ও জাঁকজমক অনেককে আতঙ্কিত করত। খুব কমজনই সাহস সঞ্চয় করে বাদশাকে তাদের অভাব অভিযোগ জানাতে পারত। কিন্তু যখনই কোন অভিযোগ বাদশার নজরে আনা হোত তিনি কঠিন হাতে দোষীকে শাস্তি দিতেন। সুবিচার দেবার জন্য নবারের হস্ত(েপের নানা উদাহরণ উপকথায় পরিণত হয়েছে।

শা-জাহান একজন দ(প্রশাসক ছিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাফি খানের মতে রাজ্য জয় এবং আইনের প্রতিষ্ঠায় যদিও আকবর শ্রেষ্ঠ ছিলেন তথাপি সুশাসন ও অর্থনৈতিক প্রগতির (ে ত্রে শা-জাহানের সাথে তুলনীয় কোনও নবাব কখনও ভারতে শাসন করেন নি। শা-জাহান আকবরের চালু করা প্রশাসনিক কাঠামোয় খুব কমই পরিবর্তন করলেও রাজকর্মচারীদের কাজে কোনও রকম গাফিলতি সহ্য করতেন না। প্রশাসনিক জটিলতার উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ নজর রাখতে নবাব কখনও ক্লান্ত হতেন না। তাঁর এই মনোভাব থেকেই এক সজীব প্রশাসন জন্ম নেয়। এই বিষয়ে তাঁর সুযোগ্য মুখ্যমন্ত্রী সাদুল্লা খাঁ তাঁকে ভালভাবে প্রশাসন পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করেন। শা-জাহানের রাজত্বে আইন-শৃঙ্খলা থাকায় শান্তি বিরাজ করত। সমসাময়িক ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি অনুযায়ী রাজ্যে জনগণের যাতায়াতের এবং সম্পত্তির পূর্ণ নিরাপত্তা ছিল। চুরির অপরাধে কখনও কাউকে শাস্তি দিতে হয় নি।

শা-জাহানের সময়ে রাজ্যে শান্তি থাকার কারণে সাধারণ প্রজার শ্রী ও সমৃদ্ধি আসে। তিনি পাঞ্জাবে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত শুষ্ক খালগুলির সংস্কার করেন এবং নতুন খাল খনন করেন। লাহোর, আগ্রা, ফতেপুরী এবং আমেদাবাদে অনেক কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করায় অনেকের কর্মসংস্থান হয়। হিন্দু ব্যবসায়ীরা ধনী ছিল এবং তাদের কারো কারো সরকারের উপর গভীর প্রভাব ছিল। ১৬৩৮ সালে আমেদাবাদে শান্তিদাস নামক এক ধনী ব্যবসায়ী বিশাল এক মন্দির নির্মাণ করে নগর শেঠ উপাধি লাভ করেন। বার্নিয়ার নামক এক বিদেশী পর্যটক শা-জাহানের রাজত্বের সমৃদ্ধির সম্বন্ধে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে খুবই প্রশংসা করেন। বাঙ্গলা সম্বন্ধে তিনি বলেন —"বাঙ্গলায় জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রাচুর্য পর্তুগীজদের দ্বারা বিতাড়িত দোআশলা পর্তুগীজ ও অন্য অনেক খৃষ্টীয় লোকদের বাঙ্গলায় আশ্রয় নিতে অনুপ্রাণিত করে। বাঙ্গলার প্রাচুর্য এবং সেখানকার নারীদের সৌন্দর্য্য এবং নরম স্বভাব পর্তুগীজ, ইংরাজ ও ডাচদের মধ্যে একটা কথা চালু করেছিল যে, বাঙ্গলায় ঢোকার শত দরজা আছে কিন্তু বেরোবার কোনও পথ নেই।

কবি, দার্শনিক এবং পন্ডিতেরা সবাই রাজদরবারে হাজির হত এবং বাদশার আনুকুল্য লাভ করত। নবাবের এই মহান উদাহরণ তাঁর উচ্চ শ্রেণীর প্রতিনিধিদের মধ্যে সংত্র(ামিত হয় এবং তারা ও প্রতিভাশীল লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। রাজদরবারে সাহিত্যবিষয়ে দ(বেশ কিছু ব্যক্তি(ছিলেন। হিন্দি ও ফারসী ভাষা সেখানে পাশাপাশি বিকাশ লাভ করে। ডাঃ সাক্সেনা লিখেছেন যে শা-জাহানের রাজত্বকালে হিন্দি ভাষা এবং সাহিত্যের সবচেয়ে বেশী বিকাশ ঘটে। হিন্দি কবিদের মধ্যে সুন্দর দাস, চিন্তামনি এবং কবিন্দ্র আচার্য উল্লেখযোগ্য ছিলেন। সাইদল গিলানী, আবদুল তালিব কালিম এবং কুদসী ছিলেন ফারসী ভাষার কবিদের মধ্যে অন্যতম। নবাব সংগীতের অনুরাগী ছিলেন। রাজ দরবারের প্রতিথযশা সংগীতকাররা ছিলেন লাল খাঁ, গুন সমুদ্র (তান সেনের জামাই) এবং জগন্নাথ। শেষোক্ত(সংগীতকার মহা কবি রায় সুখ সেন উপাধি পান এবং গিটারে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। বিনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন সুর সেন।

উৎকৃষ্ট স্থাপত্যের জন্য শা-জাহানের নাম তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সমাদৃত। তিনি স্থাপত্যের একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যেখানে যেখানে তিনি গেছেন সেখানেই তিনি বিশাল, দর্শনীয় ইমারত তৈরী করান। তিনি দুর্গ, রাজপ্রসাদ এবং মসজিদ নির্মাণ করান। মুঘল স্থাপত্যের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টিগুলির জন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী। এই সব স্থাপত্যের মধ্যে তাজমহল, মতি মসজিদ, জামা মসজিদ, দিওয়ানি আম ও দিওয়ানি খাস প্রভৃতি সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ। বাদশার প্রিয়তমা মুমতাজ মহলের স্মৃতিসৌধ্য তাজমহল তার সৌন্দর্যের জন্য পৃথিবীর বিস্ময় হিসাবে ধরা হয় এবং চিরকালের আনন্দের উপকরণ হিসাবে গণ্য হয়। সমগ্র স্থাপত্যের ইতিহাসে এইরকম নির্মাণ আর কখনও হয়নি এবং এইরকম আর একটি নির্মাণের কল্পনাও কখনও হয় নি। এটি চোখকে তৃপ্তিতে এবং হৃদয় আনন্দে ভরিয়ে তোলে। অন্য স্থাপত্যকলাগুলি তাদের নিজস্ব গঠনশৈলী এবং সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। যদিও সেগুলি স্বকীয়তায় এবং নকশায় সর্বোৎকৃষ্ট নয়, তথাপি কা(কার্য এবং সমৃদ্ধ অলঙ্করনের জন্য অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র। দেওয়ানি খাসের ব্যয়বহুল রূপোর আচ্ছাদনের কা(কার্য এবং দেওয়ানি খাসের রূপোর আচ্ছাদনে সোনা, মহার্ঘ পাথর এবং মার্বেলের কা(কার্য আমীর খুস(র খোদিত লিপিকেই সার্থক প্রমাণ করে ঃ "পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থেকে থাকে তা এখানেই, তা এখানেই, তা এখানেই।"

বাস্তবে শা-জাহান রাজকীয় বিলাস এবং জাঁকজমকের অনুরক্ত(ছিলেন। তিনি পৃথিবীর কাছে ভারতের নবাবের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। সমসাময়িক ফরাসী জহুরী শা-জাহানের ময়ুর সিংহাসনের মূল্য ১৫০ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক ধার্য করেন। এটি খাটি সোনা দিয়ে তৈরী এবং মূল্যবান রত্নখচিত। এটা প্রচলিত কাহিনী যে শা-জাহানের প্রথম রাজ্যাভিষেকের সময় নবাব ১ কোটি ৬০ ল(টাকা খরচ করেন এবং নিজেকে মূল্যবান ধাতু ও রত্ন দিয়ে ওজন করান। পরে এগুলি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

এখন শা-জাহানের রাজত্বকালের অন্যদিকগুলিতে চোখ ফেরান যাক। শা-জাহানের রাজত্বকালে ১৬৩০ সালে দা(িণাত্য, গুজরাট, খান্দেশে ভয়াবহ দুর্ভি(দেখা দেয়। বহু লোক অনাহারে মারা যায়। আবদুল হামিদ লাহোরির বর্ণনা অনুযায়ী "অভাব এমন স্তরে পৌঁছায় যে মানুষ পরস্পরকে খাওয়া শু(করে এবং পুত্রের ভালবাসার চেয়ে তার দেহের মাংস প্রিয় হয়ে ওঠে।" পিটার মুন্ডি লেখেন যে জাতীয় সড়কগুলিতে মৃতদেহ ছড়ান থাকত এবং সেগুলি দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ ছিল। জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। ডাঃ ভিনসেন্ট স্মিথ তীব্র নিন্দা করে বলেন যে সরকার জনগণের এই দুর্গতি লাঘবের জন্য তার প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করেনি।

মধ্য এশিয়ায় শা-জাহানের নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বনাশ ডেকে আনে। তাঁর পারস্যের কাছ থেকে কান্দাহার পুর্ণদখলের চেষ্টা সফল হয়নি। তিনবার কান্দাহার অভিযানে প্রচুর অর্থ এবং লোক(য় হওয়া সত্ত্বেও তিনি এক ইঞ্চি জমিও দখল করতে পারেননি। হিসাব করে দেখা গেছে এই অভিযানে ১২ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। এর ফলে শুধু মুঘলদের সম্মানহানি হয়েছিল তাই নয় মুঘলদের সামরিক অপদার্থতাও বাইরের শক্তি(র কাছে প্রকট হয়ে উঠেছিল। মধ্য এশিয়ায় শা-জাহানের অভিযান দুর্দশার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। বাদশা তাঁর পূর্বপু(ষদের মত হৃদয়ের গভীরে পিতৃপু(ষদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভু-ভাগ বালাখ এবং বদকশান বিজয়ের আশা পোষণ করতেন। অন্তঃবিরোধের সুযোগ নিয়ে মুঘলরা যুবরাজ মুরাদের নেতৃত্বে বালাখ আত্র(মণ করে। প্রাথমিক ভাবে তারা সফল হলেও এই জয় তারা স্থায়ী করতে পারেনি। উজবেকরা জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে ফলে ঔরঙ্গজেবকে কঠিন কষ্ট করে পিছু হটতে হয়। স্যার যদুনাথ সরকারের হিসাব অনুযায়ী এক ইঞ্চি জমি বা কোনরকম রাজনৈতিক সুবিধা আদায় ছাড়াই এই অভিযানে রাজকোষ থেকে ৪ কোটি টাকা খরচ হয়।

পিতামহ আকবরের অনুসৃত ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি শা-জাহান উল্টে দেন। তিনি তাঁর নিজের ধর্মের সত্রি(য় সমর্থক হয়ে ওঠেন। হয়ত তাঁর স্ত্রী মুমতাজ মহলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি এটি করেন। তিনি আবার তীর্থকর চালু করেন, এমন কি ধর্মান্তরকরণে উৎসাহ যোগান। তাঁর পিতার আমলে শু(হওয়া হিন্দু ধর্মীয় স্থানগুলি তিনি

১৬৩২ সালেই ধ্বংসের আদেশ দেন। একমাত্র বারাণসীতেই ৭৬টি মন্দির ধুলিসাৎ করা হয়। পরে বাদশার সুবুদ্ধি ফিরে আসে এবং তিনি ধর্মীয় বিষয়ে হস্ত(েপ না করার নীতি গ্রহণ করেন। ডাঃ ত্রিপাঠীর মতে "শা-জাহানের শাসনকে কোনও অর্থেই ব্যাপক ধর্মীয় নির্যাতন, গোঁড়ামি অথবা অসহিষ্ণু(তার কাল বলা যায় না।"

শা-জাহানের শাসনকাল খুঁটিয়ে দেখলে এটা প্রমাণিত হয় যে উপর উপর যা দেখা যায়, গভীরে তা সব সময় নাও দেখা যেতে পারে। রাজ দরবারের সীমাহীন শ্রী-র পাশাপাশি দেখা যেত অপশাসনের ফলে সাধারণ কৃষক এবং হস্তশিল্পীদের জীবনের ন্যুনতম চাহিদা থেকে বঞ্চনার ছবি। সাধারণ জনগণ, যাদের শ্রীবৃদ্ধির উপর সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নির্ভর করত, তাদের উপর বাদশার সামরিক বাহিনী ও আমলাদের জন্য ত্র(মবর্দ্ধমান খরচ জোগান দেবার অসহ্য বোঝা চাপান হয়েছিল। রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি(ত্র(মশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল এবং একই সঙ্গে খাজনা আদায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঢিলেঢালা হয়ে পড়েছিল। ডাঃ স্মিথ নিন্দা করে বলেন যে রাজ্য শাসনের বিষয়ে শা-জাহান তার সময়ের অন্য রাজাদের চেয়ে বেশী নিষ্ঠুর, বি(্বাসঘাতক এবং অসাধু ছিলেন না, কিন্তু তাদের চেয়ে অবশ্যই ভালও ছিলেন না। এই উক্তি(আমাদের কাছে খুব কঠোর মনে হতে পারে, কিন্তু বাদশা বৃদ্ধ হবার সাথে সাথে তার পুরানো কর্মদ্যোম এবং শক্তি(হারিয়ে সহজ আমোদ-প্রমোদের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। ড্রাইডেন ঔরাঙ্গজেবের সাথে তুলনা করে লেখেন যে ঃ— O' had he still that character maintained, of vator which in blooming youth he gained. He promised in his East a glorious Race; Now, sunk from his Meridian, sinks apace, But as the Sun, when he from noon declines, And with abated heat less fiercely shines, Seems to grow milder as he goes away, Pleasing himself with the remains of day; So he who in his youth for glory strove, would recompense his Age with Ease and Love.

স্ট্যানলি লেনপুল মন্তব্য করেন যে রাজ্য শাসনের বোঝা তার আমোদপ্রমোদে বাধা হয়ে ওঠায় তিনি তার (মতা চার পুত্রের মধ্যে হস্তান্তর করার চেষ্টা করেন। এইভাবে শা-জাহান তাঁর প্রশাসনকে ঢিলেঢালা করে তোলেন এবং রাষ্ট্রের ধ্বংসকামী শক্তি(গুলি আটকানোর প্রয়াস থেকে বিরত থাকেন।

শা-জাহান দীর্ঘকাল গত হয়েছেন কিন্তু খুব কম মানুষই তাঁর অন্তিম দিনগুলির দুঃখ-কষ্টের জন্য বিলাপ করবে। কিন্তু তাঁর নির্মিত অপূর্ব স্থাপত্যগুলি তাঁর স্মৃতিকে চিরনবীন রাখবে। এটা সত্যি যে এগুলি তৈরী করতে গিয়ে সাধারণ লোক হতদরিদ্র হয়ে অসহনীয় জীবন কাটিয়েছে। কিন্তু সাধারণের জীবনে দুঃখকষ্ট নেই, এরকম শাসনের কথা কে বলতে পারে। কিন্তু শা-জাহানের দৃষ্টিগোচর করলে তিনি তাদের দুঃখ দূর করার এবং দোষীকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করতেন।

একক ৪ ❑ সম্রাট এবং শাসকগোষ্ঠী

গঠন

৪.০ সম্রাট ও শাসকগোষ্ঠী
৪.১ মনসবদারী প্রথা
৪.২ ভূমি রাজস্ব বা জাব্ত ব্যবস্থা
৪.৩ সমালোচনা ও পরিসমাপ্তি
৪.৪ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা
৪.৫ অনুশীলনী
৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ সম্রাট এবং শাসকগোষ্ঠী

রাজপুত ঃ আকবরের সাথে রাজপুতদের সম্পর্ককে মুঘলদের শক্তি(শালী রাজা ও জমিদারদের প্রতি অনুসৃত নীতির পটভূমিতে বি(-ষণ করতে হবে। হুমায়ুন যখন ভারতবর্ষে ফিরে আসেন, তখন তিনি এই সমস্ত শ্রেণীর মন জয় করার উদ্দেশ্যে প্রয়াস চালান।

আকবরও পিতার এই ঐতিহ্য মেনে চলেন এবং তিনি নিজেও তাঁর নিজের সময়ের আত্তীকরণ ও সাংস্কৃতিক অভিযোজনের এক ফসল ছিলেন। আকবর সিংহাসনে আরোহনের পরেই অম্বরের শাসক বিহারীমল আকবরের দরবারে আসেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর তাঁর আজমীর যাত্রাকালে জানতে পারেন যে স্থানীয় মুঘল অধিপতিদের দ্বারা বিহারীমল অপদস্থ হয়েছেন। বিহারীমল ব্যক্তি(গতভাবে উপঢৌকন পাঠিয়ে এবং তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা রেখাবাইকে আকবরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে এই বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করেন।

ওই সময়ে মুসলমান শাসক ও হিন্দু রাজাদের কন্যাদের মধ্যে বিয়ে অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু আকবর এই বিয়েতে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেন। তিনি একটি নতুন নীতি গ্রহণ করে তাঁর হিন্দু পত্নীদের সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি পত্নীদের পিতামাতা ছাড়াও অভিজাতবর্গের মধ্যে অবস্থিত আত্মীয়দেরও সম্মানের স্থান দিয়েছিলেন। বিহারীমল একজন সম্মানিত ব্যক্তি(ছিলেন। তাঁর পুত্র ভগবান দাস ৫০০০ মনসবদারীর পদে ও পৌত্র মান সিং ৭০০০ মনসবদারীর পদে উন্নীত হন। আকবর অম্বরে কাছুওয়াহা শাসকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রতিও বিশেষ জোর দেন। ওখানকার নাবালক রাজপুত্র দনিয়লকে অম্বরে বিহারীমলের পত্নীদের কাছে বড় করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উজবে বিদ্রোহের সময় বিহারীমল সর্বদা আকবরের সহায়তা করে গেছেন। এর পরে বিহারীমল ও ভগবান দাসকে সম্রাটের বাহিনীতে নজর রাখার গু(ত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এমনকী তারা রাজবাড়ির মহিলাদেরও পাহারা দেবার অধিকার পেয়েছিলেন। এই অধিকার শুধুমাত্র সেই অভিজাতরাই পেতেন যাদের সঙ্গে সম্রাটের আত্মীয়তা আছে। কাছুওয়াহা রাজকুমারীর মাধ্যমে সেলিমের জন্ম আকবরকে অম্বরের শাসকবর্গের আরও নিকটবর্তী করে তোলে।

কিন্তু আকবর বৈবাহিক সম্পর্ককে কখনই একটি বাধ্যতামূলক পূর্বশর্ত করে তোলেননি। উদাহরণস্বরূপ রণথম্ভোরের হাদাসদের সঙ্গে বৈবাহিক কোনো সম্পর্কই ছিল না। তবুও তারা আকবরের অভিজাতবর্গের মধ্যে অত্যন্ত উঁচু স্থানে ছিলেন।

আকবরের রাজপুত নীতির সঙ্গে ধর্মীয় সহিষু(তার নীতি মিলিত হয়েছিল। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে আকবর জিজিয়া কর তুলে দেন যার সাহায্যে উলেমারা প্রায়ই অ-মুসলমানদের নির্যাতন করতেন। এর আগেই তিনি তীর্থকর বিলোপ করেছিলেন। যুদ্ধে বন্দীদের জোর করে ধর্মান্তরিতকরণও তিনি বন্ধ করেন।

এসব উদার পদ(প সত্ত্বেও ১৫৬৮ সালে চিতোর পতন ও তারপরে রণথম্ভোর দখলের পরেই আকবরের রাজপুতদের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা বাড়ে। ওই সময় নাগাদ বেশীরভাগ অগ্রণী রাজপুত শাসকরাই আকবরের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন এবং ব্যক্তি(গতভাবে আকবরকে উপঢৌকন পাঠাতে শু(করেছিলেন। জয়সলমীর ও বিকানীরের শাসকরাও ইতিমধ্যে আকবরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। মেবারই ছিল একমাত্র রাজ্য যা মুঘল আধিপত্য মানতে চায়নি। চিতোর ও তার আশেপাশের সমতলভূমি মুঘল আধিপত্যাধীনে এলেও, উদয়পুর ও পাহাড়ী অঞ্চল তখনও পর্যন্ত রাণার অধীনেই ছিল।

১৫৭২ সালে আকবর উদয় সিংয়ের উত্তরাধিকারী প্রতাপের কাছে মুঘল আধিপত্য মেনে নেবার আর্জি জানিয়ে বেশ কয়েকটি দৌত্য পাঠান। কিন্তু কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়নি। শেষ পর্যন্ত ১৫৭৬ সালে হলদিঘাটের প্রান্তরে দুই প(র মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং রাণা পালিয়ে যান। ঐ দুই প(আবার গোগুন্ডার যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং দুই প(ই নিজেদের বিজয়ী বলে দাবী করেন। এরপরে রাণা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কখনই ধরা পড়েননি। কিন্তু যে ল(্যের জন্য তিনি উদ্বুদ্ধ ছিলেন, সেই ল(্য ততদিনে প্রায় হারিয়ে গেছিল, কেননা বেশীরভাগ রাজপুত রাজ্যই ততদিনে মুঘল বশ্যতা মেনে নিয়েছে।

তাই একটি ত্রিমাত্রিক নীতি, যথা বৈবাহিক সম্পর্ক, যুদ্ধ ও কূটনীতির সাহায্যে আকবর রাজপুতদের রাষ্ট্রের এক নির্ভরযোগ্য মিত্র করে তুলেছিলেন। রাজপুত রাজাদের মুঘল দরবারে সম্মানজনক কাজ দেওয়া মুঘল মনসবদারদের মত সমান সম্মান দেওয়া, আটামটি ধর্মীয় সহিষু(তা, পূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি সৌজন্যমূলক ব্যবহারের দ্বারা আকবর রাজপুত রাজাদের সঙ্গে তাঁর মিত্রতাকে দৃঢ় করেন। তাই রাণা প্রতাপের মুঘল বশ্যতা স্বীকার করা প্রত্যাখ্যান অন্যান্য রাজপুত রাজ্যের ওপর খুব ীণ প্রভাব ফেলেছিল। কেননা, তারা বুঝতে পেরেছিল যে বর্তমান অবস্থায় ছোট ছোট রাজ্যগুলির প(সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখা সম্ভব হবে না। উপরন্তু রাজপুত রাজ্যগুলিতে একটি উদার স্বশাসন কায়েম রেখে (উদাহরণস্বরূপ রাজপুতদের তাদের ওয়াতন জাগীরের ওপর কিছু বিশেষ সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়।) আকবর যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাকে রাজপুত রাজারা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করেনি।

মেবার ছাড়া, মারবাড়েও আকবরকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মালদেওয়ের কনিষ্ঠপুত্র চন্দ্রসেন মুঘল আধিপত্য মেনে নিতে অস্বীকার করলে আকবর ১৫৬২ সালে মারবাড়কে পুরোপুরিভাবে মুঘল শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। পরে, চন্দ্রসেনের দাদা উদয় সিং এর ওপর যোধপুরের দায়িত্ব অপর্ণ করেন। তাঁর অবস্থানকে আরও জোরদার করে তুলতে আকবর উদয় সিং এর কন্যা যোধাবাইকে বিয়ে দেন তাঁর পুত্র সেলিমের সঙ্গে। বেশ কিছু হিন্দু অনুষ্ঠান এই বিয়েতে পালিত হয়।

আকবরের বিকানীর ও বুঁদির শাসকদের সঙ্গেও ব্যক্তি(গত সম্পর্ক ছিল। এঁরা বেশ কিছু যুদ্ধে অত্যন্ত দ(তার সঙ্গে লড়াই করেছেন। ১৫৯৩ সালে বিকানীরের রাজা রাই সিং এর জামাতা যখন মারা যান আকবর স্বয়ং রাজার বাড়ি দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেন ও তাঁর কন্যাকে "সতী" হতে বারণ করেন, যেহেতু তাঁর সন্তানেরা তখনও ছোট ছিল।

আকবরের রাজপুত নীতি মুঘল রাষ্ট্র ও রাজপুত দু'পক্ষের পক্ষেই উপকারী হয়েছিল। এই বন্ধুত্বের ফলে মুঘলরা এই দেশের সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধাদের পেয়েছিল, রাজপুতরা সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সংহতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। আকবরের রাজপুতনীতি তিনটি পর্যায়ে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছিল। প্রথম পর্যায়ে, যা প্রায় ১৫৭২ সাল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, যে সমস্ত রাজপুত রাজারা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছিল, তাদের রাষ্ট্রের অনুগত মিত্র মনে করা হত। দ্বিতীয় পর্যায়কে ১৫৭২ সালে গুজরাট অভিযান থেকে শুরু বলে মনে করা যায়। এই সময় থেকে রাজপুতরা সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত হিসাবে দেখা দেয়। রাজপুতদের সঙ্গে আকবরের সম্পর্কের তৃতীয় পর্যায় ১৫৭৮ থেকে শুরু হয়। ঐ সময় রাজা ভগবান দাস এবং মান সিং উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীরে অভিযানের জন্য পশ্চিম পাঞ্জাবের ডেরায় সম্রাটের তাঁবুতে এসে পৌঁছন। এই ঘটনার সময়ে আকবরের সঙ্গে গোঁড়া ধর্মীয় নেতাদের সম্পর্ক ভেঙে যায়, সদর শেখ আবদুল নবীর বিতাড়ন ও আকবরের মহজর এর প্রশ্নে এই বিরোধ বেধেছিল। এর পর থেকেই রাজপুতদের সর্বত্র ব্যবহার করা হতে থাকে। এমনকী তাদের রক্তের সম্পর্কের রাজকুমারদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে পাঠান হয়।

আকবরের রাজত্বের বাকী কয়েকটি বছরের মধ্যে অংশীদার হিসাবে রাজপুতদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। ১৫৮৬-৮৬ সালের মধ্যে রাজপুতদের চারটি সুবার যুগ্ম শাসক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এই সুবাগুলি হল লাহোর, কাবুল, আগ্রা এবং আজমীর।

এই সন্ধি রাজস্থানে শান্তি নিশ্চিত করেছিল এবং রাজপুতরা তাদের মাতৃভূমির নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে দূরদেশে গিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারতেন। এর ফলে তাদের সম্মান ও সামাজিক প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। মুঘলদের সঙ্গে কাজকর্মে আর্থিক সুযোগ-সুবিধাও লাভ করে রাজপুতরা। রাজপুতদের সম্পদ আরও বৃদ্ধি করতে তাদের বংশানুক্রমিক জাগরী বাদে আরও নতুন জাগীর দেওয়া হয়। রাজপুত রাজাদের ওয়াতন জাগীর দেওয়া হয় তাঁদের নিজস্ব বাসভূমিতেই। এই জাগীরগুলিকে কোনো শাসকের জীবদ্দশায় হস্তান্তরিত করা যেত না।

তাদের নিজেদের প্রদেশের মধ্যে মোটামুটি স্বশাসন বজায় রাখতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে মুঘলরাও এক ধরনের কর্তৃত্ব দাবী করেছিল, যার অর্থ ছিল এই যে, রাজপুত রাজার। একে অন্যের অঞ্চলে হানা দেবেনা বা সীমানা নিয়ে কোনো বিবাদে যুদ্ধের আশ্রয় নেবে না। এছাড়া উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি এখন থেকে অধিকারের থেকে সম্রাটের দয়ার ওপরেই অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

আকবরের রাজপুত নীতি তাঁর উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান মেনে চলেন। এই নীতির সাহায্যে মুঘলরা এক সর্বভারতীয় মুঘলিকা বা মুঘল সাম্রাজ্য গঠন করতে পেরেছিলেন। এর ফল ছিল শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন। এই নীতির অবক্ষয় শেষের দিকে পারস্পরিক উৎকণ্ঠা ও চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

মনসবদারী প্রথা ঃ মুঘলদের দ্বারা সৃষ্ট এক অদ্বিতীয় প্রথা ছিল মনসবদারী প্রথা। বৃহত্তর অর্থে মনসব বলতে কাউকে কোনো পদে অধিষ্ঠিত করা বোঝায়। যা সরকারি শ্রেণীক্রমে তাঁর মর্যাদা ও বেতন নির্ধারণ করে। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য হিসাবে মনসবের অধিকারীকে বেশ কিছু সশস্ত্র সৈন্যের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হত। অধিকারীকে যে কোনো শাসনতান্ত্রিক বা সামরিক কাজে বা দরবারের সভাসদ হিসাবে নিয়োগ করা যেত। তাই মনসবদারী ছিল এমনই একটি প্রথা যাতে নাগরিক ও সামরিক দুই প্রকারের দায়িত্বেরই মিশ্রণ ঘটানো হয়েছিল। যদিও নগদে বেতন দেওয়া যেত, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জাগীর প্রদান করাই ছিল রীতি। জাগীর প্রদানের অর্থ ছিল, রাষ্ট্রের প্রাপ্য যাবতীয় অর্থ সংগ্রহ করার অধিকার। অভিজাতদের দেওয়া মনসবের পরিমাণ ১০ থেকে ৫০০০ পর্যন্ত হতে পারত। ছেষট্টি ধরনের প্রচলিত এই মনসব ১০ এর গুণিতক হিসাবে ১০০ পর্যন্ত এবং তারপরে ৫০ ও ১০০-র গুণিতক হিসাবে চালু ছিল।

তবে এর কোনো স্থিরতা ছিল না যে এই ছেষটি ধরনের মানের মনসব সবসময়ই প্রদান করা হত। ছেষট্টি সংখ্যাটি প্রধানতঃ ছিল একটি কাল্পনিক পবিত্র সংখ্যা। কাগজেকলমে যেহেতু এটি একটি একক চাকরী ছিল। সেহেতু একজনকে নিম্নতম মানে প্রবেশ করে পরে ধীরে ধীরে উন্নতি করতে হত। কিন্তু ৫০০০ থেকে ১০০০০ পর্যন্ত মনসবগুলি রাজপরিবারের রাজপুত্রদের জন্য সংর(ত ছিল।

মনসবের সংখ্যাগত মানকে প্রায়ই চেঙ্গিস খানের সময় থেকে গণনা করা হয়। চেঙ্গিস খান তাঁর সেনাবাহিনীকে ১০ থেকে ১০০০০ পর্যন্ত মানে বিভক্ত(করেছিলেন। ধ্রুপদী মুসলমান লেখকেরা রাষ্ট্রের কর্মচারীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত(করেছিলেন। যোদ্ধারা ছিলেন আশাবউস-সাইফ বা অসিচালনায় দ(দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন হিসাবর(ক, কেরানী ও আশাবউল-কলম্ এর দপ্তরের অন্যান্য কর্মচারীরা। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলেন ধর্মতত্ত্ববিদ বা বিচারক বা আশাব-উল-আমামাহ্ বা পাগড়ীআলা মানুষেরা। হুমায়ুনও তাঁর সৈন্যবাহিনীর একটি শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন।

এই হল আকবরের রাজত্বের ৪০তম বর্ষের (১৫৯৫-৯৬) দ্বৈত পদমর্যাদা বা জাট ও সওয়ার পদ চালু করবার পটভূমি। মনসবদারী প্রথা চালুর সঠিক সময় নিয়ে মোরল্যান্ড ও আবদুল আজিজের মত পন্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

একটি শক্তি(শালী সৈন্যবাহিনী ছাড়া আকবরের প(রাজ্যবিস্তার ও তার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব ছিল না। এই উদ্দেশ্যে অভিজাতশ্রেণী ও সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত করার প্রয়োজন ছিল। মনসবদারী প্রথার সাহায্যে তিনি এই দুই উদ্দেশ্যই চরিতার্থ করেছিলেন। আবুল ফজলের মতে মনসবদারদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যারা নিজেদের মনসবের সমান সংখ্যক সওয়ার প্রতিপালন করতেন, তাদের প্রথম শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হয়েছিল। যারা মনসবের অর্ধেক বা তার বেশি সংখ্যক সওয়ার প্রতিপালন করতেন তাদের নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। যারা মনসবের সংখ্যার অর্ধেকেরও কম সংখ্যক সওয়ার যাদের ছিল, তাঁরা ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত(।

বহুদিন ধরে জাট ও সওয়ারের অর্থ নিয়ে এক জটিল মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। এর কারণ হল আকবরের অধীনে মনসব পদ্ধতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। সুতরাং গোড়ার দিকে প্রায় ১৫৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত এটি ছিল অন্য ধরনের। তখন এতে শুধুমাত্র একটিই পদ ছিল। দ্বৈত জাট ও সওয়ার পদ্ধতি ১৫৯৫-৯৬ সালের পর চালু হয়েছিল। "জাট" বলতে বোঝায় কোনো অভিজাতের ব্যক্তি(গত বেতন ও তাঁর মর্যাদা। সওয়ারের অর্থ হল বাস্তবে যতগুলি ঘোড়সওয়ার তার প্রতিপালন করার কথা।

অভিজাতরা যেসব সওয়ারদের নিয়োগ করতেন, তারা অভিজ্ঞ ও দ(কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হত। এই উদ্দেশ্যে যোদ্ধার একটি বর্ণনামূলক ত্র(মিক সংখ্যা (চেহারা) রাখা হত এবং তার ঘোড়াকেও সম্রাটের নিজস্ব ব্যবস্থায় চিহ্নি(ত করা হত (দাগ পদ্ধতি)। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক অভিজাতকে তাঁর বাহিনীকে নিয়ে সম্রাটের নিযুক্ত(ব্যক্তি(দের কাছে পর্যবে(ণের জন্য আসতে হত। ঘোড়াগুলিকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পর্যবে(ণ করা হত এবং শুধুমাত্র আরব বা ইরাকে জাত উন্নত শ্রেণীর ঘোড়াগুলিকেই রাখা হত। সব থেকে উত্তম ব্যবস্থা হিসাবে প্রত্যেক দশজন অশ্বারোহীর জন্য কুড়িটি ঘোড়া রাখতে হত। এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কেননা যুদ্ধে অগ্রগতির সময় ঘোড়াদের বিশ্রাম দিতে হত এবং যুদ্ধের সময় বদলীর প্রয়োজন খুব বেশী ছিল। মাত্র একটি ঘোড়া থাকলে একজন সওয়ারকে অর্ধেক বা অসম্পূর্ণ মনে করা হত। যতদিনই এই ১০-২০ নিয়ম মানা হত, ততদিন মুঘল অশ্ববাহিনী ছিল সুদ(।

অভিজাতদের বাহিনীগুলিকে এক মিশ্র চরিত্র দিতে মুঘল, পাঠান, হিন্দুস্তানী, রাজপুত সব গোষ্ঠী থেকে লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। এর সাহায্যে আকবর উপজাতিবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের শক্তি(গুলিকে দুর্বল করে দিতে চেয়েছিলেন।

অশ্বারোহী ছাড়া তীরন্দাজ, বন্দুকধারী, পরিখাকর্মী ও খনিকর্মীদেরও নিয়োগ করা হয়। এদের প্রত্যেকের মাইনের তারতম্য ছিল এবং একজন সওয়ারের গড় মাইনে ছিল মাসে কুড়ি টাকা। ইরানী ও তুরানী সৈনিকরা আরও বেশি

পেত। পদাতিক সৈন্যরা মাসে তিন টাকা পেত। এই সমস্ত ধরনের সৈনিকদের প্রাপ্য অর্থ ও মনসবদারের নিজস্ব মাইনে যোগ করা হত ও মনসবদারকে দেয় অর্থ জাগীর প্রদানের মাধ্যমেই প্রদান করা হত। কখনো কখনো মনসবদারদের নগদেও বেতন দেওয়া হত। আকবর নিজে জাগীর পদ্ধতি পছন্দ না করলেও পুরোপুরি এই পদ্ধতি বর্জন করতে পারেননি, কেননা এর শেকড় অনেক গভীরে পৌঁছে গেছিল।

মুঘলদের অধীনের যে মনসবদারী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তা ছিল বিশিষ্ট ও অদ্বিতীয়। এর কোনো সঠিক সমান্তরাল ব্যবস্থা ভারতের বাইরে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজের ব্যক্তি(গত খরচ সামলানো ছাড়াও মনসবদারদের নিজস্ব বেতন থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘোড়া, হাতি, উট, খচ্চর ও মালপত্র বহন করার গাড়ী রাখা এবং র(ণাবে(ণের খরচ দিতে হত। আবদুল আজিজের দাবীতে এইসব পশুগুলি র(ণাবে(ণের খরচ মনসবদারেরা তাদের নিজস্ব বেতন থেকে দিতেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ শিরীন মুসভির বক্ত(ব্য অনুযায়ী মনসবদাররা এদের ভরনপোষণের জন্য অতিরিক্ত(অর্থ পেতেন, যার ফলে এই পশুগুলি বোঝা না বরং সম্পদ হয়ে উঠেছিল। যাইহোক, আবুল ফজল স্পষ্টই বলেছেন যে ভারবাহী পশুগুলিকেও দাগের জন্য হাজির করতে হত। এই সমস্ত খরচ সামলানোর জন্য মুঘল মনসবদারদের ভারী বেতন দেওয়া হত। সাধারণভাবে, এই বেতনের কিছু অংশ পরিবহনের জন্য ব্যয়িত হত। তা সত্ত্বেও মুঘল মনসবদাররা ছিল পৃথিবীর সর্বোচ্চ বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী।

সুতরাং মনসবদারী ব্যবস্থা বেতন, পদোন্নতি, সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি চিরাচরিত প্রথার বিবর্তনকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। এই পদ্ধতির সাহায্যে আকবর সাম্রাজ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের মানুষকে একটি সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি একে রাজকীয় ইচ্ছাপূরণের একটি নির্ভরযোগ্য যন্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। আকবর ভারসাম্য নীতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন জাতির ও ধর্মের মানুষকে একটি মাত্র ব্যবস্থায় আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে অনেক দিক থেকে বিচার করেই বলা যায় সুলতানী আমলে প্রচলিত সামরিক সংগঠনের চেয়ে মনসবদারী ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে অনেক উন্নত হয়ে উঠেছিল।

প্রাচীন উপজাতীয় গোষ্ঠীপতিত্ব ও মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থার মধ্যবর্তী এক ব্যবস্থা ছিল এটি। কয়েকটি শর্তের অধীনে কয়েকজন প্রধান কর বা খাজনা গ্রহণের দায়িত্বে থাকতেন। আগের দু'টি ব্যবস্থার সুযোগসুবিধা গ্রহণ করে এই ব্যবস্থা আগের দু'টি ব্যবস্থার থেকেই উন্নততর হয়ে উঠেছিল। জাতিগত আত্মীয়তাই তাদের নিজের নিজের প্রধানের প্রতি অনুগত করে তুলেছিল। এর ফলে, বড় ধরনের কেন্দ্রীয় সংগঠন ছাড়াই বিশাল সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখা সম্ভব হয়েছিল। অথচ দলপতিদের তরফ থেকে বিদ্রোহের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এই ব্যবস্থায় অভিজাতদের দ্বারা নিযুক্ত(বাহিনী এবং উপজাতীয় খাজনা আদায়ের স্থানে আসে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক সৈন্যবাহিনী। পরাত্র(ান্ত মুঘলেরা একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী র(ণাবে(ণ ও দেখাশুনা করতে স(ম হয়েছিল। এই কারণেই তাঁরা আনুষ্ঠানিক আনুগত্যে আবদ্ধ ও পদোন্নতির আশায় আশান্বিত মনসবদারদের কাজে লাগাতে উৎসাহী ছিলেন। এসব ছাড়াও আপনা থেকেই এই ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যের সর্বত্র অস্ত্রশস্ত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক সুবিধা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা মনসবদারদের তরফ থেকে পূর্ণ আনুগত্যকে নিশ্চিত করেছিল। অন্যদিকে পদমর্যাদা, আয় ইত্যাদি সম্বন্ধে অনিশ্চিয়তার ফলে, মনসবদারদের ব্যক্তি(গত দ(তার মাধ্যমে বিশিষ্টতা লাভের অবিরল প্রচেষ্টা থাকত, যাতে রণদ(তা সবচেয়ে বেশী কাজে লাগানো যায়। সেজন্য গঠনের শু(র থেকেই ল(্য রাখা হত কোন ইউনিট কোন কাজের প(সবচেয়ে উপযুক্ত(এবং তাকে সেই কাজেই লাগান হত। এমনকী একটি ইউনিটের অপর একটি ইউনিটের বি(দ্ধে কূটনৈতিকভাবে ব্যবহারও করা হত। মনসবদার শ্রেণীগুলির জাতিগত গঠনই ছিল বি(্বাসঘাতকতার বি(দ্ধে এক চূড়ান্ত বাধা। মধ্য এশিয়ার উজবেক, পারসিক, আফগানদের প্রত্যেকের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ছিল এবং রাজপুতরা তাদের বি(দ্ধে এক ভারসাম্য র(া করত। মনসবদাররা রাজকীয় বদান্যতা লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে একটি ন্যূনতম দ(তা, অনুশাসন ইত্যাদি বজায় রাখত। তাই আবদুল আজিজের

ভাষায় মনসবদারী সৈন্যবাহিনী অভিজাতশ্রেণী ও নাগরিক প্রশাসনের সব মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু কোনো পদই বংশানুত্র(মিক ছিল না, সেহেতু এই জীবিকাটি সকলের সামনেই খোলা ছিল। এই ব্যবস্থায় গুণের কদর ছিল ও দ(তাকে উৎসাহ দেওয়া হত।

কিন্তু এই ব্যবস্থার বেশ কিছু ত্রুটিও ছিল। আকবর জাট-সওয়ার ব্যবস্থা, ঘোড়াকে চিহ্নি(ত করা বা সৈন্যতালিকা সম্বন্ধে বিশদ নিয়মবিধি চালু করেও অবাধ দুর্নীতিকে রোধ করতে পারেননি। সৈন্যতালিকাও ঘোড়ায় দাগ দেওয়া সত্ত্বেও খুব কম মনসবদারই বেতন অনুযায়ী যে সংখ্যক অশ্বারোহী রাখা উচিত সেই পরিমাণ অশ্বারোহী রাখতেন। মনসবদাররা প্রায়শই সম্রাটকে ঠকাতেন। চাষবাসের ে(ত্রেও জমা ও খরচের মধ্যে ব্যবধান ত্র(মশঃই বেড়ে চলেছিল। এর ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে জাগীরের অসম বন্টন আরও কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে। সমস্ত সম্পদ মাত্র কিছুসংখ্যক লোকের হাতেই পুঞ্জীভূত হয় ও অযথা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। সৈন্যদলকে তাদের দলপ্রধানের মাধ্যমে বেতন দেবার প্রথা কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করতে বাধ্য ছিল। প্রায়ই দেখা যেত নির্দিষ্ট সৈন্যরা সম্রাটের তুলনায় তাদের অব্যবহিত প্রধানের কাছেই বরং বেশী অনুগত ছিল। মনসবদার ও তাঁর সৈন্যদলের মধ্যে জাতিগত ও ব্যক্তি(গত বন্ধন অনেকসময়ই সৈন্যবাহিনীর সংহতি এবং সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত। মনসবদারী ব্যবস্থায় কোন মৌলিক কেন্দ্র বা জাতীয় সৈন্যবাহিনীর প(যা একান্ত জ(রী, সেই সংহতির অভাব ছিল। অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, অনুশাসন কিংবা দ(তা—কোনো বিষয়েই কোনো সমতা ছিল না।

মনসবদারের সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটায় অসন্তোষ ও অদ(তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাঁচশো ও ৫০০০ এর মধ্যবর্তী মনসবদারের সংখ্যা আকবরের আমলে ছিল ২৪৯। জাহাঙ্গীরের আমলে তা বেড়ে হয় ৪৩৯ এবং শাহজাহানের আমলে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৬৩-তে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষদিকে, যাবতীয় মনসবদারের সংখ্যা হয়েছিল ১৪,৪৪৯। সৈন্যবাহিনীর তালিকায় এই ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি প্রচন্ড আর্থিক বোঝার সৃষ্টি করে। কিন্তু মূলতঃ এটি সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক বিস্তার ও ত্র(মাগতঃ যুদ্ধবিগ্রহে জমানোরই ফল। মনসবদারদের নিযুক্তি(ও পদোন্নতি মূলতঃ ব্যক্তি(গত, জাতিগত ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা দ্বারাই নির্ধারিত হত। এম. ভি. পিয়ারসন মন্তব্য করেছেন "সম্রাট ও মনসবদারের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তাকে পৃষ্ঠপোষক-মক্কেল সম্পর্ক বলা যায়। এই সম্পর্কের স্থায়িত্ব সম্রাটের ধনসম্পত্তির পরিমাণ ও (মতার ওপরেই নির্ভরশীল ছিল এবং তা চিরস্থায়ী ছিল না। আকবর তাঁর নিজস্ব গুণাবলী ও যুদ্ধজয়ের দ্বারা মনসবদারদের আনুগত্য লাভ করতে স(ম হয়েছিলেন। শাহজাহানের ব্যর্থতা আনুগত্যের সেই বাঁধনকে দুর্বল করে তুলেছিল। ঔরঙ্গজেব সাম্রাজ্য তৈরীর নীতি আবার গ্রহণ করলেও, দা(িণাত্যে তাঁর ব্যর্থতা মনসবদারদের আনুগত্যে আরও ফাটল ধরায়।

মনসবদারেরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত(থাকায় সর্বদাই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজতে ব্যস্ত ছিল। নিজেদের পদোন্নতির জন্য তারা রাষ্ট্রের সাধারণ স্বার্থও বলি দিতে প্রস্তুত ছিল। যেহেতু তাদের চাকরী ও সম্পত্তি সম্রাটের খেয়ালখুশীর ওপরেই নির্ভরশীল ছিল, তারা প্রত্যেকবার উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে জয়ী প(যোগদানের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। উন্নততর পদমর্যাদা ও লাভজনক জাগীর পাওয়ার জন্য মনসবদারদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত, তার ফলে ভাঙনের শক্তি(গুলি জোরদার হয়ে উঠেছিল। জে. এফ. রিচার্ডস দেখিয়েছেন যে মনসবদারদের সংখ্যা বাড়ার ফলে জাগীরের যে অপ্রতুলতা দেখা দিয়েছিল, তা প্রধানতঃ ঔরঙ্গজেবই ঘটিয়েছিলেন। ঘুষ দেওয়া, মনসবের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি তখনকার দিনের প্রায় রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যেক মনসবদারই দরবারে নিজের অবস্থা গোছাতে ব্যস্ত ছিল। এই অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় কাঠামোকে দুর্বল করে তুলেছিল, যদিও এই রাজনীতি কোনোদিনই সশস্ত্র লড়াই পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এটি মুখ্যতঃ দরবারের ষড়যন্ত্র পর্যন্ত সীমিত ছিল। সম্রাট সমস্ত দলের মধ্যেই একটি ভারসাম্য বজায় রেখে নিজের সিংহাসন বাঁচাতে চাইতেন। কিন্তু এইভাবেই তাঁর নিজের অবস্থা দুর্বল হয়। নাগরিক প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত মনসবদারেরা, যাদের সামরিক বিষয়গুলির সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিলনা,

তারাও এই সমস্যায় জড়িয়ে গেছিলেন। তাঁরা সৈন্যদলের প্রশি(ণ বা তাদের মধ্যে পেশাদারী ব্যবস্থা আনার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় দরবারের ছবি তাদের বিল্যাসব্যসনের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল, যা সামরিক জীবনের পরিপন্থী ছিল। সতীশ চন্দ্র লিখেছেন, "প্রাপ্ত সামাজিক উদ্বৃত্ত শাসনের খরচ বহন করতে, এক বা অন্য প্রকারের যুদ্ধের ব্যয় চালাতে, শাসক শ্রেণীর আশা-আকাঙ(া অনুযায়ী জীবন-প্রণালী বজায় রাখার প(অপর্যাপ্ত ছিল।" আথার আলির মতে, "বিলাসদ্রব্যের মূল্য সপ্তদশ শতাব্দীতে বাড়তে শু(করে। ইউরোপের বাজারে ব্যাপক চাহিদার ফলে সরবরাহ অনেকটা পশ্চিমমুখী হতে থাকে এবং ইরান, ভারতবর্ষে সেই কারণেই মূল্য বাড়ে।" উপরন্তু মনসবদারদের বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন বাড়েনি।

মনসবদাররা কোনোদিনই রাজনৈতিক সুস্থিরতার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে পারেননি, এবং কখনওই কোন স্বাধীন বংশানুত্র(মিক আভিজাত শ্রেণী তুলতে পারেননি, যার অবস্থা ও সম্পদ প্রত্যেক প্রজন্মেই রাজার পছন্দের উপর নির্ভর করে থাকবে না। তারা এই কারণে কোনোদিনই রাজকীয় অত্যাচারের বি(দ্ধে শক্তি(শালী ও সাহসী প্রতিপ(হবার সার্মথ্য পাননি। ইংল্যান্ডে বংশানুত্র(মিক ব্যারনদের সুযোগসুবিধা সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক অধিকারসমূহের পটভূমি প্রস্তুত করেছিল। মুঘল ব্যবস্থায় এরকম সুস্থ সাংবিধানিক বিকাশের কোনো জায়গাই ছিল না।

৪.২ সম্রাট ও শাসকগোষ্ঠী-ভূমি রাজস্ব বা জাব্ত ব্যবস্থা

মধ্যযুগে আমদানী-রপ্তানীর ওপর ধার্য শুল্ক, অন্তঃশুল্ক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের করব্যবস্থার থেকে আয় হত না। ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে ভূমি-রাজস্বই ছিল আয়ের প্রধান উৎস। সে যুগে জনকল্যাণ এবং প্রশাসনিক দায়িত্বের কোনো ধারণা না থাকায় এবং এগুলি একেবারেই আধুনিক ধারণা হওয়ায় এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে শাসিতের তুলনায় শাসকের স্বার্থই অনেক বেশী গু(ত্বপূর্ণ ছিল। সুতরাং, কৃষকদের উপকারের কথা সম্পূর্ণ উপে(া করে তাদের ওপর রাজস্বের গু(ভার চাপাতে রাজা বিবেকের কোনো দংশন অনুভব করতেন না। আলা-উদ-দিন-খলজীর আমলে জমির সমগ্র উৎপাদনের অর্ধেক খাজনা হিসাবে নির্ধারিত হয়। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে, রাজস্ব আদায়ের (ে ত্রে দিল্লীর সুলতান শাহীর যুগে কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। জমি ও উৎপাদন পরিমাপের কোনো সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল না এবং রাজস্ব আদায়ের ভার সামরিক প্রশাসক বা জাগীরদারদের ওপর ন্যস্ত ছিল। এর ফলে শুধু প্রজাদের উপরেই যে শুধু দুর্বিসহ করের বোঝা চেপেছিল তাই নয়, রাষ্ট্রও এর যথাযোগ্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। সামরিক কর্মচারী বা জাগীরদার যারা রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন, তারা যে পরিমাণ রাজস্ব মানুষের কাছ থেকে আদায় করতেন তা কখনই রাজকোষে জমা দিতেন না। এর ফলে সরকার নির্ধারিত অসহ্য করভারে মানুষের নাভি(শ্বাস উঠলেও রাষ্ট্র তার কর্মচারীদের কাছে ঠকে যেত এবং রাষ্ট্রের কোষাগারের অসম্ভব (তি হত। আরেকটি ত্রুটি ছিল এই যে, হিসাবের বা পরিমাপের ব্যবস্থা ছিল খেয়ালখুশিমত এবং কৃষকের কোনো ধারণা ছিল না যে ফসল তোলার পর ঠিক কতটা তাকে রাজস্ব দিতে হবে। শের শাহ প্রথম এই বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে উঠে সুব্যবস্থার প্রচলন করতে চেয়েছিলেন এবং রাজস্বব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করেছিলেন।

প্রশাসনিক ইতিহাসের দলিলে বিচ(ণ ও উপকারী ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য শেরশাহের নাম সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ, যা ভবিষ্যতের কৃষি ব্যবস্থার জন্য একটি আদর্শ হিসাবে গড়ে উঠেছিল। তাঁর সংস্কার শুধুমাত্র যে রায়তদের প(ই মঙ্গলকর হয়েছিল তাই নয়, রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধিরও সহায়ক হয়েছিল। শেরশাহ সরাসরি কৃষকের সাথেই রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন। সমগ্র ভূমিব্যবস্থাকে তত্ত্বধানের সাহায্যে জরিপ করে, উপাদানের এক-চতুর্থাংশ অংশ রাষ্ট্রের অংশ বলে নির্ধারিত হয়। নগদে বা শস্যে রাজস্ব দেওয়া যেত। কিন্তু প্রথম ধরণটিই বেশী পছন্দসই ছিল। রায়তের স্বার্থর(ার্থে বন্দোবস্তের একটি রেকর্ড রাখা হত। সরকার কৃষকের কাছ থেকে

একটি চুক্তি(পত্র পেত (কবুলিয়াৎ) এবং কৃষক একটি স্বত্বাধিকারপত্র (পাট্টা) পেত। রাষ্ট্রের কর্মচারীরা কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতেন কিন্তু কৃষকেরা সরাসরি পরগণার কোষাগারেও তাঁর দেয় জমা দিতে পারত। শের শাহ সঠিক সময়ে রাজস্বের পুরোটাই জমা দেবার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি কর্মচারীদের প্রাপ্য রাজস্ব হিসাব করার সময় কোমল এবং কর আদায়ের সময় কঠোর হবার নির্দেশ দেন। কিন্তু শেরশাহের রাজস্ব দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। তাঁর অধিকাংশ ভাল কাজই তাঁর আকস্মিক এবং অকালমৃত্যুতে নষ্ট হয়ে যায় এবং এর ফলে দুর্বল প্রশাসন এবং পরবর্তীকালে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

যখন হুমায়ুন তাঁর সিংহাসন পুন(দ্ধার করেন, তখন তিনি দেখেন যে সাম্রাজ্যের জমি "খালসা" এবং "জাগির" এই দুই ভাগে বিভক্ত(। অভিজাত এবং আমিররা জাগির প্রথায় জমির মালিকানার জন্য সরকারকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিত এবং পরিবর্তে যত খুশী টাকা কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করত। "খালসা" জমি সরকারের ছিল এবং তা থেকে আলাদা শস্যের জন্য আলাদা রাজস্ব আদায় করত। ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ লেখেন, "সাম্রাজ্য যেহেতু ছোট ছিল এবং সমস্যাও সহজ ধরনের ছিল, তাই কোনও অসুবিধা অনুভূত হয়নি।"

আকবরের অভিষেক ভারতের ইতিহাসে এক সদাশয় স্বৈরতন্ত্রের যুগের সূচনা করে। সম্রাট জনগণের কল্যাণের বিষয়ে ব্যগ্র ছিলেন। নিজের রাজত্ব সুদৃঢ় করার পর তিনি প্রশাসনের সমস্ত বিভাগের পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। রাজস্ব বিভাগ তাঁর অগ্রাধিকার লাভ করে। রাজা টোডরমলের সাহায্যে মুজাফফর খাঁ ঘুরবাতি ১৫৭০-৭১ সালে রাজস্বের সমস্ত পদ্ধতির পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। সত্যিকারের আদায়ের ভিত্তিতে বর্তমান রাজস্বের পরিবর্তনের পদ(েপ নেওয়া হয়। জমির সঠিক চরিত্র এবং সঠিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ স্থির করার জন্য স্থানীয় কানুনগোদের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই হিসাব সাম্রাজ্যের রাজধানীতে দশজন উর্দ্ধতন কানুনগো খুঁটিয়ে পরী(া করতেন। এরা এই কাজের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। কিন্তু সমস্ত পরিশ্রম উজবেক বিদ্রোহের জন্য পন্ড হয়ে যায়। গুজরাট বিজয়ের পর টোডরমল জমির সঠিক পরিমাপ করান এবং জমির পরিমাপ ও গুণের ভিত্তিতে রাজস্বের হিসাব নির্ণয় করেন। ১৫৭৫-৭৬ সালে আকবর রাজস্ব প্রশাসনে আর একবার পরী(া চালান। বাংলা, বিহার ও গুজরাট বাদে সমস্ত সাম্রাজ্য ১৮২টি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি ভাগ থেকে এক কোটি টঙ্কা (২৫০,০০০) রাজস্ব আশা করা হত। প্রত্যেকটি ভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী পদাধিকারীর পদের নাম ছিল "ত্রে(ারিস"। শীঘ্রই তারা লোভী এবং দুর্নীতি- পরায়ণ হয়ে ওঠায় এই পদ্ধতি মসৃণভাবে কাজ করতে পারে নি। ত্রে(ারী পদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে পুরানো খাজনার বিভাগ চালু করা হলেও পরবর্তি সময়ে জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের আমলেও ত্রে(ারি পদবীর ব্যবহার দেখা যায়।

১৫৮২ সালে টোডরমল দিওয়ান-ই-আশ্রাফ নিয়োগ করেন। স্ট্যানলি লেনেপুনে লেখেন, "মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত টোডরমলের চেয়ে প্রসিদ্ধ কোনও নাম ছিল না এবং এর কারণ ছিল আকবরের সংস্কারের আর কোনও দিক জনগণের কল্যাণের এত কাছে পৌঁছাতে পারে নি যা রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে পেরেছিল। এই কাজের উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের অহেতুক ভারাত্র(ান্ত না করে এমন একটি সঠিক রাজস্ব নি(পণ করা যা সরকারী প্রশাসনকে ভালভাবে চালু রাখবে।" এতদিন বাৎসরিক উৎপাদন বর্তমান বাজার দর ভিত্তি করে রাজস্বের হিসাব হত। ফলে রাজ্যের দাবী প্রতিবছর আলাদা হত। রাজস্ব আদায়কারীরা রাজধানী থেকে যতদিন নির্ধারিত খাজনা ঘোষণা না করত ততদিন রাজস্ব আদায় করতে পারত না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য টোডরমল অনেকগুলি সংস্কারের সূচনা করেন। তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল ঃ (ক) জমির মাপ, (খ) জমির শ্রেণী নির্ণয়, (গ) রাজস্ব নির্ধারণ। রাজস্বের প্রতিবছর ওঠানামা থেকে র(া পাবার জন্য তিনি "দশ শালা (দশ বছর)" রাজস্ব হার চালু করেন। সৎ এবং বিশ্বস্ত মানুষদের পূর্বতন পাঁচবছরের ব্যক্তি(গত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে এবং পাঁচ বছরের সত্যকারের রাজস্ব আদায়ের পরিমাপ বিচার করে দশ বছরের (১৫৭০-৭১ থেকে ১৫৭৯-৮০) গড় রাজস্ব আদায় শু(হয়। যত্ন করে জমির মাপ হয়। এই কাজে পূর্বে শনের দড়ি ব্যবহার করা হত। আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে এই দড়ির মাপের পরিবর্তন

হত। ভেজা আবহাওয়ায় এর দৈর্ঘ সঙ্কুচিত এবং শুকনো আবহাওয়ায়-এর দৈর্ঘ প্রসারিত হত। টোডরমল ৩৩ ইঞ্চি মাপের "ইলাহি গজ" ব্যবহার শু(করেন। এগুলি তানাব (তাবুর দড়ি) অথবা জারির (শৃঙ্খল) বা লোহার বলয় দ্বারা সংযুক্ত(বাঁশ দ্বারা তৈরী হত।

চাষের ধারাবাহিকতা অথবা অবচ্ছিন্নতার উপর ভিত্তি করে জমিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল ঃ (১) পোলাজ-বাৎসরিকভাবে ধারাবাহিক চাষ করার উপযুক্ত(, (২) পারাউতি, যে জমি এক বা দুই বছর অনাবাদি করে ফেলে রাখা হয়েছে, (৩) চাষের—জমির উর্বরতা ফিরিয়ে আনার জন্য যে জমি দু-এক বছর ফেলে রাখা হয়েছে (৪) বানজার—যে জমি পাঁচ বা ততোধিক বছর অনাবাদি রয়েছে। প্রথম তিন শ্রেণীভুক্ত(জমিকে তিনটি ত্র(মে ভাগ করা হয়—উৎপাদনের মাত্রা অনুসারে ভাল, মধ্যম ও খারাপ। তিনটিরই গড় উৎপাদনের হিসাব নিয়ে রাজস্ব নির্ধারিত হত। শুধুমাত্র যতটা জমি চাষ করা হয়েছে তা হিসাব করে উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ খাজনা হিসাবে রাজ্য দাবী করত। সরকারী আধিকারিকরা বিভিন্ন ফসলের বিভিন্ন প্রদেশে মূল্যের প্রভেদের জন্য বিভিন্ন রাজস্ব হার নির্ধারণ করত। ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন, "যথাকালে একদল সরকারী কর্মচারী শস্যের হিসাব তৈরীর জন্য কতটা জমি চাষ হয়েছে, তা দেখার জন্য গ্রামে যেত। প্রত্যেক মালিকানার প্রত্যেক শস্য দেখে বিটিকচি হার নির্দিষ্ট করত এবং চাষীর সরকারকে রাজস্ব দেবার পরিমাণ বলা হত।" এটিকে "জাবতি" ব্যবস্থা বলা হত এবং এটি আগ্রা, এলাহাবাদ, বিহার, দিল্লী, লাহোর, মালওয়া, মুলতান, অযোধ্যা এবং আজমীর ও গুজরাটের কিছু অংশে চালু ছিল।

একই সাথে আরও দু'টি পদ্ধতি চালু ছিল। সেগুলি হল ধলাবক্স এবং নাসাক্। ধলাবক্স সম্ভবতঃ ভারতীয় রাজস্ব হিসাবের পদ্ধতি ছিল যাতে শস্যের একটি ভাগ শাসক নিতেন। এটি সিন্ধুতে এবং কাশ্মীর ও কাবুলে আংশিকভাবে প্রচলিত ছিল। নাসাক পদ্ধতিও হিসাবের জন্য বহুল প্রচারিত এবং পুরানো ছিল। ডাঃ ত্রিপাঠীকে উদ্ধৃত করলে—এতে জমির মাপজোক বা শস্যের শ্রেণী বিভাগ না করে সম্ভবত জমির মালিক এবং সরকারের মধ্যে মোটামুটি সংক্ষিপ্ত কায়দায় একটি রাজস্বের চুক্তি(হত।" এই পদ্ধতি বাংলা ও গুজরাটের কিছু অংশে চালু ছিল।

প্রফেসর আর. এস. শর্মা লেখেন যে নতুন বন্দোবস্তের গুণ এর সঠিক হিসাব, যা নাকি খুবই সযত্নে করা নিখুঁত জরিপের উপর নির্ভরশীল ছিল। একর প্রতি উৎপাদনের ভিন্নিতে জমিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা এবং চাষের ধারাবাহিকতার বিচারে জমিকে ভাগ করার নীতিটি প্রচলিত নীতির চেয়ে অনেক বেশী বিজ্ঞানসম্মত ছিল। এই নতুন পদ্ধতির আর একটি বিশেষ গুণ ছিল এর স্থায়ীত্ব যেহেতু এই পদ্ধতির জন্য কোনও সময়সীমা স্থির করে দেওয়া হয়নি। শের শার প্রচলিত পদ্ধতি থেকে আকবর দু'টি গু(ত্বপূর্ণ উন্নতি ঘটান।

খাজনা আদায়কারীদের প্রতি সম্রাটের বিশেষ নির্দেশাবলী এবং চাষীদের কল্যাণের জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তারা বলেছিলেন "রায়তদের চাষবৃদ্ধির জন্য উৎসাহ যোগাও এবং সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তাদের চাষ করতে দাও।" তাদের সব চুষে নিও না কারণ রায়তরা স্থায়ী। খরা দেখা দিলে কৃষকদের অগ্রিম দেওয়া হত, ত্রাণ দেওয়ার জন্য সরকারী কাজ শু(করা হত। কৃষককে তার দেয় খাজনা নগদে বা বস্তু দিয়ে, এমনকি নিজে সরকারী কোষাগারে গিয়ে দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ডাঃ ত্রিপাঠী লেখেন যে রাজস্ব আদায়কারীকে কোষাগারে রায়তের রাজস্ব দেবার দিন নির্দিষ্ট করে দেবার জন্য এবং কোষাধ্য(কে রায়তদের প্রতিটি খাজনা আদায়ের রসিদ দেবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়।

৪.৩ সমালোচনা ও উপসংহার

আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থার প্রায় সব ঐতিহাসিকই প্রশংসা করেছেন। যত(ণ সম্রাট শক্তি(শালী ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন কার্যকরী থাকত ততদিন এই নীতি ভালভাবে কাজ করত। ভাবনা ও তার প্রয়োগের মধ্যে খুব কমই ভেদ থাকত,"

যা আবুল ফজল আইনি আকবরিতে বলেছেন। কালত্র(মে প্রশাসনের মান খারাপ হওয়ায় এই ভেদবাড়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। কাজেই সরকারী আধিকারিকরা রায়তের প্রতি সবসময় যত্নশীল থাকার বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। স্যার যদুনাথ সরকার লেখেন, "সরকার এবং রায়তের মধ্যে বিবাদ সবসময় রাজস্ব আদায় নিয়ে হত এবং বাকী খাজনা খুব কম সময়েই আদায় হত। বাকী খাজনা আদায়ের নাম করে রায়তের কাছ থেকে তার বেঁচে থাকার ন্যুনতম বস্তু বাদ দিয়ে সব হরণ করাই ছিল এই অনৈতিক চত্রে(র অবশ্যম্ভাবী পদ(ে প।" দ্বিতীয়ত মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব এক যথেষ্ট বোঝা ছিল এবং তা প্রচলিত হিন্দু আইন রীতিতে নির্ধারিত এক ষষ্ঠাংশ থেকে অনেক বেশী ছিল। যখন আমরা বুঝতে পারি যে সরকার কৃষকদের সাহায্যের জন্য বাস্তবিক প(ে কিছুই করত না তখন আমাদের কাছে এটি খুব অত্যাচার মনে হয়। এডওয়ার্ড এবং গ্যারেট লেখেন যে—আকবরের সময়েও রায়ত পারিপার্শ্বিক থেকে খুব কমই সাহায্য পেত। উৎপাদিত পণ্য উপযুক্ত(মূল্যে বিত্র(ী করার সুবিধার অভাব ছিল। সমাজ সামগ্রিকভাবে চাষের উন্নতির জন্য কিছুই করত না। দুর্ভি(ে র সময় কোনও সাহায্য ছাড়া কৃষক একাই বোঝা বহন করত। হয়ত রাষ্ট্র তার দাবী কিছু কমাত। পরে তার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম দিকের একটি আদেশ প্রমাণ করে যে আধিকারিক এবং জায়গিরদাররা রায়তের জমি দখল করে নিত এবং নিজেরা চাষ করত। প্রশাসন নিজের প্রয়োজনে অথবা অন্যলোককে দেবার জন্য রায়তকে তার অধিকারের জমি প্রত্যেকবার বদল করতে বাধ্য করত। এইভাবে রায়ত তার দখলী সম্পত্তিতে কোনও স্থায়ী মালিকানা তো হত ভোগ করতনা এবং ফলে কোনরকম উদ্যম দেখান না"

মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি(এখনও এমন কোনো পথ বা পন্থা আবিষ্কার করতে পারেনি যার দ্বারা কোনো বিভাগের নিখুঁত প্রশাসন সম্ভব। আমরা যদি আধুনিক মাপকাঠির সাহায্যে মধ্যযুগীয় শাসকদের বিচার করতে যাই আমরা নিশ্চিতভাবে তাদের কৃতিত্বকে খাটো করব। আকবরের সময়ের সাপে(ে তাঁর রাজস্ব প্রশাসন ছিল অসাধারণ। ডঃ স্মিথের মত একজন সমালোচকও বলেছেন "সং(ে পে বলা যায় এই ব্যবস্থা ছিল প্রশংসনীয়। নীতিগুলি ছিল যথাযথ এবং আধিকারিকদের দেওয়া নির্দেশগুলিতে যা যা বাঞ্ছনীয়, সেই সব কিছুকেই অর্ন্তভুক্ত(করা হয়েছিল।

৪.৪ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

দিল্লী সুলতানশাহীর আমলে সাম্রাজ্যের অধীন প্রদেশগুলিকে কোন নির্দিষ্ট সীমানা দিয়ে ভাগ করা হয়নি। ইক্ত(ার অধিকারী মাক্তি(রা প্রশাসনিক ও সামরিক (মতার অধিকারী ছিলেন এবং আশা করা হত যে তারা ভূমি রাজস্ব আদায় করতে ও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। স্থায়ী প্রশাসনের যন্ত্রটি ছিল সরকার।

আকবর এই ব্যবস্থাই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন এবং প্রায় ১৫৮০ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল। ১৫৮০ সালে এই সাম্রাজ্য যা ততদিনে গুজরাট, বাংলা, বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, তাকে ১২টি সুবাহ্, বা প্রদেশে বিভক্ত(করা হয়। সুবাহ্র শাসনতান্ত্রিক প্রধানকে বলা হত সিপাহসালার বা সেনাপতি, যদিও শেষদিকে সুবাদার বলার প্রচলন দেখা দেয়। সুবাহ্র প্রধান বা রাজ্যপালকে দিওয়ান, বক্সী, কাজী, বিচারের জন্য মীর-আদল, একজন কোতোয়াল, একজন মির বাহ্র বা নদীগুলির ও বন্দরের তত্বধায়ক ও একজন ওয়াকিয়া নবিস বা বার্তালেখক সাহায্য করতেন। এই কর্মচারীরা রাজ্যপালের অধীনস্থ হলেও তাঁর দ্বারা নিযুক্ত(হতেন না। এরা সরাসরিভাবে সম্রাটের দ্বারাই নিযুক্ত(হতেন এবং তাঁকেই কৈফিয়ৎ দিতেন এবং তাঁদের মন্ত্রকের প্রধানকেও কৈফিয়ৎ দিতেন। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি প্রাদেশিক সরকারের ে(ত্রেও মেনে চলা হত।

আকবরের অধীনে, শেষের দিকে বিজিত ওড়িশাকে বাংলার এবং কাশ্মীরকে কাবুল সুবার অর্ন্তভুক্ত(করা হয়। আধুনিক উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানা চারটি প্রদেশ গঠন করেছিল। যথা এলাহাবাদ, অযোধ্যা, আগ্রা এবং দিল্লী। পরের

দিকে সাম্রাজ্য দা(ণাত্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করলে, আরও তিনটি প্রদেশ খান্দেশ, বেরার ও আহম্মদনগর সৃষ্টি করা হয়। এই প্রদেশগুলোকে একজন রাজপ্রতিনিধির অধীনে স্থাপন করা হয়। এই রাজপ্রতিনিধি প্রায়শই কোনো রাজপুত্র হতেন।

১৫৮৬ সালে পরী(ামূলক পদ(প হিসাবে আকবর প্রত্যেক প্রদেশে দু'জন শাসনকর্তা নিয়োগ করা স্থির করেন। আবুল ফজলের মতে এই পদ(প গ্রহণ করা হয়েছিল যাতে একজন শাসনকর্তা বিব্রত না হয়। হয়তো, সত্যিকারের উদ্দেশ্য ছিল শাসনকর্তাদের (মতার একটি উর্ধ্বসীমা বজায় রাখা। কিন্তু এর ফলে অপ্রয়োজনীয় রাগারাগির সৃষ্টি হয় এবং এই ব্যবস্থা পরিত্যক্ত(হয়।

আইন-ই আকবরীতে প্রত্যেকটি সুবার ভৌগোলিক সীমারেখা, জলবায়ুর সং(প্ত বিবরণ, সাধারণ পরিস্থিতি, উৎপাদিত সামগ্রী, ইতিহাস ইত্যাদি পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি প্রদেশকে সরকারও পরগণায় বিভক্ত(করা হয়। প্রত্যেকটি সরকারের হিসাব করা আয়, জমিদারদের কি শ্রেণী, তাঁর অধীনে কত সৈন্য আছে ইত্যাদিও নথিভুক্ত(করা আছে আইন-ই-আকবরীতে। এরকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কারণ স্বশাসিত রাজাদের অঞ্চলকে রাজ্য হিসাবে নথিভুক্ত(করা হয়নি, বরং তাদের অধীনস্থ অঞ্চলগুলিকে সুবা, সরকার বা পরগণার অর্ন্তভুক্ত(করা হয়। এইভাবেই মেবারকে চিতোর সরকারের অর্ন্তভুক্ত(করা হয় এবং জয়পুর আজমীর সরকারের অধীনে একটি পরগণায় পরিণত হয়। এই সমস্ত সুবাহগুলির আয়তন, নির্ধারিত আয় ইত্যাদির এক বিশাল ব্যাপ্তি ছিল। বাংলা সুবার অধীনে চব্বিশটি সরকার ছিল ও বাংলার নির্ধারিত আয় ছিল প্রায় ১ কোটি ৫০ ল(টাকা। মূলতানের অধীনে তিনটি সরকারের মোট নির্ধারিত আয় ছিল মাত্র ৩৭ ল(টাকা। অন্যান্য প্রদেশগুলির আয় এই দুই চরম সীমার মধ্যেই অবস্থান করত।

প্রাদেশিক শাসনকর্তারা ছিলেন সম্রাটের বদলে কাজ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। ঐ শাসনকর্তারা প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। তাঁদের নিযুক্তি(পত্র থেকে জানা যায় যে প্রদেশের আইন শৃঙ্খলা র(ার দায়িত্ব, সাধারণ শাসনভার, তথা সুবার জনসাধারণের কল্যাণ ও অগ্রগতির দায়িত্ব ছিল এদের হাতে। বিদ্রোহী জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ করে ভূমিরাজস্ব আদায় করার কাজে প্রাদেশিক শাসনকর্তা দিওয়ানকে সাহায্য করতেন। এছাড়াও দিওয়ানের কৃষির প্রসারের কাজ, জলাধার, কূপ, জলবাহিকা, বাগান, সরাইখানা ও নাগরিকদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ ও কোনো কিছু সারাইয়ের কাজকর্মের ব্যাপারেও তাঁকে সাহায্য করতে হত। তাঁর উপরে ফৌজদারী বিচারের সুষ্ঠ সমাধানের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। কিন্তু কাউকে প্রাণদন্ড দেবার পূর্বে তাঁকে চূড়ান্ত বিবেচনা করতে হত। তাঁকে সারা প্রদেশ জুড়ে ভ্রমণ করবার কথা বলা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে তিনি বি(্বাসী গুপ্তচর ও সংবাদলেখকদের মাধ্যমে রাজ্যের কোথায় কি ঘটছে এবং প্রত্যেকটি গু(ত্বপূর্ণ ঘটনার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন। ল(ণীয় যে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কা(র ধর্মবি(্বাসে হস্ত(প করতে নিষেধ করা হয়েছিল। শাসক সামন্তপ্রভুদের কাছ থেকে ব্রাজকেরা আদায় করার দায়িত্বে ছিলেন। এদের কোনো নির্দিষ্ট সময়কাল ছিল না কিন্তু এদের প্রায়শই বদলী করা হত।

সুবার দ্বিতীয় গু(ত্বপূর্ণ কর্মচারী ছিলেন দিওয়ান। প্রথমদিকে যদিও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের দিওয়ান নিযুক্ত(করার অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু ১৫৯৫ এর পর থেকে সম্ভবতঃ প্রধান দেওয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী তারা কেন্দ্রীয়ভাবে নিযুক্ত(হতেন। এরপর থেকে দেওয়ান প্রাদেশিক শাসকের অধীনস্থ কর্মচারী রইলেন না, এবার থেকে তিনি সহকর্মী হলেন। অবশ্য প্রাদেশিক শাসক তবুও প্রশাসনের প্রধানই রইলেন। আবুল ফজল দেওয়ানের কর্তব্য সম্বন্ধে কোনো তথ্য দেননি। কিন্তু পরের দিকের তথ্য থেকে জানা যায় প্রাদেশিক দেওয়ানরা কেন্দ্রীয় দেওয়ানের কাছে আর্থিক ব্যাপারে ও টাকাকড়ির হিসাবের পা(ক বিবরণ, দাখিল করতেন। তিনি ভূমিরাজস্ব আদায় করতেন এবং অন্যান্য কর আদায়, তার হিসাব ও তার বন্টন সুষ্ঠুভাবে সারার দায়িত্বে ছিলেন। দেওয়ানের অপর একটি মুখ্য দায়িত্ব ছিল কৃষির প্রসার ও উন্নতি ঘটান। একাজে আমিল তাঁকে সাহায্য করতেন। অবশ্য দেওয়ান আমিলের যে কোনো অত্যাচারের বি(দ্ধে বাধা দিতেন এবং আমিলের কাজকর্মের তত্বধান করতেন। তিনি দাতব্য উদ্দেশ্যে দেয় ভূমি র(ণাবে(ণ

করতেন। সুবায় বক্শী ও সদর এর কাজকর্ম কেন্দ্রে তাদের মন্ত্রকের অনুকরণেই গড়ে উঠেছিল। বক্শীকে অনেক সময় গুপ্তচর বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করতে হত। এর ফলে অনেক সময়ই তার প্রাদেশিক শাসনকর্তার সঙ্গে সংঘর্ষ লাগত। কেননা, শাসনকর্তার অন্যায় আচরণ নিয়ে তাকে প্রায়ই দরবারে অভিযোগ জানাতে হত। সদ্র ধর্মীয় অনুদানগুলির সুপারিশ জানাতেন এবং বিচারবিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করতেন। আকবর কাজীদের কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন না। সুতরাং তিনি প্রদেশে বিচার-বিভাগের কর্মচারী হিসাবে মীর-আদ্লদের নিযুত্ত(করেন। কাজীদের এদের অধীনে সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করতে হত।

নগরের আইন-শৃঙ্খলা র(ার দায়িত্বে ছিল কোতওয়াল। তাকে শহরের সাধারণ সুযোগসুবিধা যেমন ওজনের সঠিক মাপ ও অন্যান্য মাপ ঠিক রাখা, জুয়া খেলা নিয়ন্ত্রণ করা ও বেশ্যাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে হত।

প্রদেশের শাসনকর্তারা একটি দলের প্রধান হিসাবে কাজ করতেন। কর্মচারীরা প্রত্যেকেই নিজেদের সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন ও কেন্দ্রে সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করতে পারতেন। ফলে শাসনকর্তাদের তরফ থেকে কৌশল ও দ(তা ছাড়া এদের সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হত না। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের এই নীতি তখনই কার্যকর হত যখন কেন্দ্রে একজন স(ম সম্রাট এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য একগুচ্ছ দ(কর্মচারী অধিষ্ঠিত থাকতেন। সাংবাদিক-গুপ্তচর প্রমুখের সাহায্যে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাজকর্মের ওপর আকবরের কড়া নজর রাখার নীতি, ব্যাপক ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষের দুঃখদুর্দশার কথা অবহিত হওয়া, অত্যাচারীদের শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদ রোধ করার প(কার্যকরী হয়েছিল। বিশেষ বিশেষ (ত্রে সম্রাট প্রাদেশিক বা স্থানীয় শাসনকর্তার বি(দ্ধে গৃহীত অভিযোগের তদন্তের জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করতেন।

এইভাবে আকবর এমন একটি প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যা স্থানীয় প্রশাসন ও কেন্দ্রের মধ্যে একটি যোগাযোগ সূত্র হিসাবে গড়ে উঠবে ও কেন্দ্রে তথ্য পাঠানোর কাজ করবে।

৪.৫ অনুশীলনী

১. তুমি কি বাবরকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মনে কর?

২. পানিপথের প্রথম যুদ্ধের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। এটি কিভাবে ভারতবর্ষের সামরিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস পরিবর্তন করেছিল?

৩. সাম্রাজ্য স্থপতি নয় বরং একজন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক ছিলেন বাবর। এই মত আলোচনা কর।

৪. ইতিহাসের উপাদান হিসাবে বাবরের স্মৃতিকথার গু(ত্ব আলোচনা কর।

৫. "বাবরের স্মৃতিকথা ভারতবর্ষ ও তার মানুষদের সঠিক চিত্র অঙ্কন করেনি।" তুমি কি এই বত্ত(ব্যকে সমর্থন কর?

৬. কেন এবং কিভাবে আকবর সুলহ-ই-কুলের বি(োসী হয়ে পড়েন? এই নতুন ধর্মমত ইসলাম ও তৎকালীন রাজনীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৭. বাবরের ভারত আত্র(মণের পূর্বে ভারতের অবস্থা কেমন ছিল? বাবর সেই অবস্থা কিভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন?

৮. হুমায়ুন ও শেরশাহের মধ্যে সংঘর্ষ আলোচনা কর। শের শাহ কেন সফল হয়েছিলেন?

৯. তুমি কি এই মত সমর্থন কর যে হুমায়ুনের সবচেয়ে শত্রু তাঁর নিজের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল?

১০. আকবর তাঁর চরম শাসনের মধ্যে কিভাবে উত্তর ভারতের শাসক শ্রেণীকে খাপ খাইয়েছিলেন?

১১. সুলহ-ই-কুলের প্রতি বিশেষ উল্লেখ সহ আকবরের ধর্মনীতি বি(ে-ষণ কর।

১২. একজন শাসক ও বিধ্বোসী হিসাবে আকবরের দর্শন ব্যাখ্যা কর। তিনি কি ইসলামকে ধ্বংস করেছিলেন?
১৩. আকবরের ধর্মনীতিকে আকার দিতে রাজনীতি কি ভূমিকা নিয়েছিল?
১৪. জাহাঙ্গীরের চরিত্র এবং ব্যক্তি(ত্বের ওপর একটি নিবন্ধ রচনা কর। এই সময়ে নূরজাহান কি ভূমিকা নিয়েছিলেন?
১৫. শাহজাহানের রাজত্বকাল মুঘল যুগের সুবর্ণযুগ ছিল—ব্যাখ্যা কর।
১৬. "প্রস্তর স্থাপত্যকীর্তির কিছু নির্দশন ছাড়া শাহজাহানের রাজত্বের সবকিছুই ছিল নএ(র্থক।" তুমি কি এই মতকে সমর্থন কর?
১৭. আকবরের রাজপুত নীতি সূক্ষ্মভাবে বিচার কর। এটি কিভাবে সর্বভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্য (pax Mughalica) গঠন করতে সাহায্য করেছিল?
১৮. মনসবদারী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি বি(-ষণ কর। এই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাগুলি কি ছিল?
১৯. মুঘল সাম্রাজ্যকে এর সৈন্যবাহিনী ও মনসবদারদের ছাড়া গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। তুমি কি সমর্থন কর?
২০. জাব্ত ব্যবস্থার একটি সমালোচনামূলক বিবরণ দাও। এই ব্যবস্থা কিভাবে শেরশাহের সংস্কার সমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল?
২১. তুমি কি মনে কর মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাই সাম্রাজ্যকে স্থিতিশীলতা দান করেছিল?
২২. মুঘল প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার সমালোচনামূলক বি(-ষণ কর।

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

1. A.C. Banerjee – New History of Medieval India
2. A.L. Srivastava –The Mughal Empire.
3. Iswari Prasad – Medieval India
4. R.P. Tripathi–Rise and Fall of the Mughal Empire.
5. Stanley Lanepool–Babar.
6. The Cambridge History of India Vol.–IV
7. A.S. Beveridge–Memories of Babar Vol.–I & II.
8. Iswari Prasad–The Life and Times of Humayun
9. I. Prasad–A short History of Muslim Rule in India.
10. V.A. Smith–Akbar the great.
11. Douglas E. Strensand–The formation of the Mughal Empire.
12. E. Vanina
13. Irfran Habib ed–Akbar and his India
14. Muzaffar Alam ed.–The Mughal Empire.
15. Rushebrooke W; Uiams–An Empire Builder of the Sixteenth Century.
16. Ibu Hasan–The Central Structure of the Mughal Empire.
17. R.P. Tripathi–Some aspects of Mughal administration.
18. Beni Prasad–History of Jahangir.
19. Rogers and Beveridge–Mendirs of Jahangir.
20. J.N. Sarkar–Mughal Administration.

21. A. Aziz–The Mansabdari System and the Mughal Army.
22. I.H. Qureshi–The Administration of the Mughal Empire.
23. B.P. Saksena–History of Shah Jahan.
24. P. Saran–The Provincial government of the Mughals.
25. W.H. More land–Agrarian system of Moslim India.
26. Raidhey Shyam –Babar.
27. Irpan Habib –Agrarian System of Mughal India.
28. Irfan Habib–Essays in Indian History.